ভারতে পরদেশী ব্যাঙ্কের বনিয়াদ

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত

প্রকাশক
বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ
১৯৩১

৺পিতৃদেবের শ্রীচরণে

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	সংশোধন
৬৮	১৫	ব্যাবসাটাকে	ব্যবসাটাকে
৭৯	১৫	স্বার্থ-সংহতি	স্বার্থ-হানি
৮২	৩	সীমাবদ্ধ	সীমাবদ্ধ
৮৭	১২	ঠেড়েই	ঠেরেই
৮৯	১৯	করাক্কড়	কড়াক্কড়
৮৯	২২	প্রসস্ত	প্রশস্ত
৯২	১	আবধ	অবাধ
৯৬	১৯	পূর্ব্বকথিক	পূর্ব্বকথিত
৯৮	১০	সমিচীন	সমীচীন
১০০	২২	করেছলি	করেছিল
১০৩	১৩	অনুমাণ	অনুমান
১০৪	৩	স্বার্থ-সংহতি	স্বার্থহানি
১০৯	২	অক্ষুন্ন	অক্ষুণ্ণ
১১৬	২৪	ব্যাঙ্ক-ব্যাবসায়ে	ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে

নিবেদন

ভারতবর্ষে যে-সকল ব্যাঙ্ক এক্সচেঞ্জ কারবার চালাইতেছে, তাহার মধ্যে প্রায় সবগুলিই পরদেশী প্রতিষ্ঠান। দেশের বহির্বাণিজ্যের পোষকতা সম্পূর্ণরূপে ইহাদের উপরই নির্ভরশীল হইয়া রহিয়াছে। জাতীয় গৌরব, সম্ভ্রম এবং সম্পদের মাপকাঠিতে এ নির্ভরশীলতা যে কত গুরুতর এবং মারাত্মক তাহা লইয়া আমাদের দেশে এখনও যথেষ্ট আলোচনা হয় নাই। এমন কি, এই পরদেশী ব্যাঙ্কগুলির ক্রিয়া-কলাপের মারপ্যাচে দেশের কতখানি স্বার্থ-হানি হইতেছে তাহাও অনেকে উপলব্ধি করিতেছেন না বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে এই জাতীয় সমস্যার দিকে বাঙ্গালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

এই সমস্যা লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করা কতকগুলি কারণে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে সাহিত্য এত বিরল যে, বই ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া এর আসল পরিচয় পাওয়া কঠিন। কাজেই এ বই লিখিতে ইংরাজি বা বাংলা গ্রন্থ অপেক্ষা অনুমান ও সেইসঙ্গে ব্যবসায়ী এবং ব্যাঙ্ক-কর্ম্মীদের সহিত সাক্ষাৎ, আলোচনা ইত্যাদির উপর বেশী নির্ভর করিতে হইয়াছে। আমার এ শ্রম কতখানি সার্থক হইয়াছে, তাহা বিচার করিবার ভার সহৃদয় পাঠকের উপর ন্যস্ত রহিল।

পুস্তকের আলোচ্য বিষয় সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া যথাসাধ্য সরলভাবে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থের বিন্যাস, বিভাগ ও বিষয়-সংস্থান সকলের মধ্যেই এই উদ্দেশ্যকে প্রধান করিয়া রাখা হইয়াছে। আশা করি বাঙ্গালী-পাঠক গ্রন্থকারের এই উদ্দেশ্য স্মরণ

করিয়া তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গীর লঘুত্ব-জনিত দোষগুলি ক্ষমা করিতে পারিবেন।

এই পুস্তক প্রণয়নে গ্রন্থকার কলিকাতার প্রসিদ্ধ বণিক-সঙ্ঘ 'বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব্ কমার্স' এর কাছে অশেষভাবে ঋণী। চেম্বারের কর্তৃপক্ষ তাহাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক-তদন্ত কমিটি ও ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-তদন্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিবার জন্য অন্যতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাকে আশাতীতরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহারা এইরূপ উৎসাহ দিয়াছেন বলিয়াই বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভব হইয়াছে। এই সুযোগে তাঁহাদের নিকট আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থে যে সকল মতামত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সমস্তই গ্রন্থকারের নিজস্ব; সুতরাং তাহার মধ্যে কোন ভুল ভ্রান্তি থাকিলে গ্রন্থকারই ব্যক্তিগত-ভাবে তজ্জন্য দায়ী থাকিবেন।

এই পুস্তক লিখিবার প্রয়াসে গ্রন্থকার বাংলার দুই যশস্বী অধ্যাপকের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির 'মিন্টো প্রফেসর অব্ ইকনমিক্স', অপর জার্ম্মাণীর মিউনিক সহরের ডয়েচ্ একাডেমির অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার। বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে ইঁহাদের সস্নেহ উদ্দীপনা গ্রন্থকারের পক্ষে এক অমূল্য সম্পদ।

১৪৪-বি, বকুল বাগান রোড, কলিকাতা
১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচী

প্রথম ভাগ—সংজ্ঞা

দ্বিতীয় ভাগ—সমস্যা

তৃতীয় ভাগ—সমাধান

প্রথম ভাগ

সংজ্ঞা

বিল অব্ এক্‌সচেঞ্জ

বরাত চিঠির অ আ ক খ

ব্যবসা-জগতে 'বিল্ অব্ এক্‌সচেঞ্জ' কথাটা আজকাল প্রায় আটপৌরে হ'য়ে এসেছে বল্লেই চলে। তবু এর যথার্থ তাৎপর্য্য যে অনেকেরই জানা নেই, একথাও ঠিক। গজলসুরের ধাঁচে ফেল্‌তে পারলে ফুটপাতের বিড়িওয়ালাও রবি ঠাকুরের গান গায়,—মানে বোঝবার ধার সে ধারে না। 'বিল অব্ এক্‌সচেঞ্জ' এর ব্যবহারটাও প্রায় তেমনি এসে দাঁড়িয়েছে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির দরওয়ান থেকে আরম্ভ করে চাঁদনী চকের গুদামপচা মাল বিক্রেতার সঙ্গে আলাপ কর, দেখবে তারা 'বিল্ অব্ এক্‌সচেঞ্জ' কেন, তার চাইতে অনেক বড় বড় কথা বেশ অভ্যস্তভাবে বলে যাচ্ছে;—অথচ এই কথাগুলির তাৎপর্য্য বোঝাতে বল্লে পাশ করা ছেলে অবধি মাথা চুলকিয়ে আম্‌তা আম্‌তা করবে। এমনি যখন অবস্থা তখন কতকগুলি চল্‌তি কথার সঠিক অর্থ বোঝবার চেষ্টা করে শেষে আলোচ্য প্রবন্ধ সুরু করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বোধ হয়। প্রথম তবে এই 'বিল্ অব্ এক্‌সচেঞ্জ' দিয়েই আরম্ভ করা যাক।

'বিল্ অব্ এক্‌সচেঞ্জ' বা বরাতচিঠি আসলে একটা আদেশপত্র। আদেশটা কোন ঋণ বা ঋণ-স্বীকারকে আশ্রয় করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক আদেশপত্রেই তিনটী পৃথক পক্ষ বর্ত্তমান থাকা চাই। তাদের একজন হ'ল আদেষ্টা, আর একজন আদিষ্ট—আর তৃতীয় পক্ষ হ'ল প্রাপক। পত্রের মোসাবিদায় আদেষ্টা আদিষ্টকে এই সূত্রে আদেশ দিয়ে থাকে যে, সে যেন আদেশপত্র দেখবার পর নির্দ্দিষ্ট তারিখে আদেষ্টার উল্লিখিত প্রাপককে নির্দ্দেশানুযায়ী নির্দ্ধারিত পরিমাণ টাকা

দিয়ে দেয়। আইন-গ্রাহ্য কোন বরাতচিঠিতে এর সবগুলি ব্যাপারই থাকা চাই,—কোনটাকে বাদ দেওয়া চলবে না। প্রথমতঃ, আগে যা বলা হয়েছে, আদেষ্টা, আদিষ্ট এবং প্রাপক তিনটী পক্ষ থাকা চাই; দ্বিতীয়তঃ, চিঠিতে টাকা দেবার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট কালের উল্লেখ থাকবে; তৃতীয়তঃ, যে টাকা দেবার জন্য আদেশ দেওয়া হবে তার পরিমাণ সূচক যথাযথ বিবৃত্তি থাকা দরকার; চতুর্থতঃ, আদেশটা কোন ঘটনা বা চুক্তিসম্বন্ধে একেবারে নিরপেক্ষ হবে।

এই হ'ল 'বিল্ অব্ একস্‌চেঞ্জ' এর ব্যাখ্যা। ওপরে এর বিশ্লেষণ করে যে সব অপরিহার্য্য গুণ দেখানো হ'য়েছে সেগুলিকে অঙ্গীভূত করে কোন আদেশমূলক পত্র লিখলেই আদালত তাকে বিল ব'লে মেনে নেবে। কিন্তু তা হ'লেও ব্যবসা-জগতে যে সবাই নিজের খুসীমত আদেশপত্রের মোসাবিদা করে নেয়, তা নয়। এর চেহারা সম্বন্ধেও একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ইংরেজিতে আজকাল যে সব আদেশপত্র ব্যবহার হ'য়ে থাকে, তাকে বাংলায় অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায়, নীচে তার একটা নমুনা দেওয়া গেল।

২৫০ পাউণ্ড, ১৮ই মে (১৯৩০) তারিখে অবশ্য দেয়। — লণ্ডন ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০

ষ্ট্যাম্প

অদ্য তারিখ হইতে তিনমাসকাল পরে মিঃ বেলকে (বা তাহার আদেশ অনুযায়ী অপর কাহাকেও) দুইশত পঞ্চাশ পাউণ্ড অর্পণ করিবে।

(সাক্ষর) জে, টমসন

মিঃ ডব্লু, পিটারসন, সমীপেষু।

ওপরের বরাতচিঠিতে আদেষ্টা হ'ল টম্‌সন, টাকা দেবার আদেশ দেওয়া হয়েছে মিঃ পিটারসনকে, প্রাপক মিঃ বেল। টাকা দেবার তারিখ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ আছে; দেয় টাকার পরিমাণও নির্দ্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। আদেশটা একবারে নিরপেক্ষ, অর্থাৎ তা কোন চুক্তি বা ঘটনার ওপর নির্ভরশীল নয়।

যদি চিঠিতে আর সব কথা যথাযথ রেখে মিঃ টম্‌সন মিঃ পিটারসন সাহেবকে শুধু দেয় টাকা সম্বন্ধে লিখ্‌ত "..............মিঃ বেলকে (বা তাহার আদেশ অনুযায়ী অপর কাহাকেও) তাহার আবাসগৃহের বিক্রয়মূল্য অর্পণ করিবে",—তাহ'লে চিঠিটা আইনের চোখে 'বিল' বলে গ্রাহ্য হ'ত না,—কেবল টাকার পরিমাণের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকবার জন্যই। আবার টাকা দেবার তারিখ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকলেও ফল এমনিই দাঁড়াত। যদি লেখা হ'ত "মিঃ বেল আমেরিকা যাইতে প্রস্তুত থাকিলে দুইশত পঞ্চাশ পাউণ্ড অর্পণ করিবে" তা'হলেও পত্রটাকে 'বিল' বলা চলত না, কারণ টাকা দেবার আদেশটা সে ক্ষেত্রে মিঃ বেল এর আমেরিকা গমন সম্বন্ধে আপেক্ষিক ব্যাপার হ'য়ে পড়ত।

বরাতচিঠির প্রকার ভেদ

মোসাবিদা অনুসারে বিলগুলির মধ্যে দুটী শ্রেণী বিভাগ চোখে পড়ে। তার এক শ্রেণীকে ইংরেজিতে বলা হয় 'বেয়ারার বিল';—গ্রহীতামাত্রই এই বিলের স্বত্বাধিকারী হ'তে পারে। যেমন ধর দশটাকা কি একশ' টাকার একখানা নোট,—তা যে কুড়িয়েও পায়, তার স্বত্ব আইনের চোখে অস্বীকার করবার উপায় নেই। 'বেয়ারার বিল' সম্বন্ধেও একথা খাটে,—তাতে প্রাপকের নাম উল্লেখ করা থাকলেও

আইনের চোখে সেটা একটা দশটাকার নোটেরই সামিল হিসেবে গণ্য হ'য়ে থাকে। কাজেই বে-আইনিভাবে এরকম বিল আত্মসাৎ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর বিলের কায়দা ঠিক এমনি নয়। তাতে প্রাপক বিলমাফিক টাকা অন্য কাউকে দেয় বলে পিছসই করে দিলেই তার অধিকার স্বত্ব হস্তান্তরিত করা চলে। প্রাপক যার নাম নির্দ্দেশ করে দেবে সেই কেবল বিলের মালিক হ'তে পারে,—তার পিছসই না পেলে বিলমাফিক টাকা আদায় করা সম্ভব হবে না। ওপরে বিলের যে নমুনা দেওয়া হয়েছে, সেটা একটা অর্ডার-বিল, তাতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে "মিঃ বেল বা তাহার আদেশ অনুযায়ী অপর কাহাকেও" বিলের টাকা দিতে হবে। যদি এর বদলে লেখা হ'ত "মিঃ বেল বা গ্রহীতামাত্রকে বিলের টাকা দিতে হইবে", তা'হলে আমরা একটা "বেয়ারার বিলের" নমুনা পেতাম। অর্ডার বিলটায় যদি মিঃ বেল 'মিঃ জ্যাককে দেয়' বলে পিছসই করে দেয় তা হ'লে মিঃ জ্যাকই কেবল বিলটার স্বত্বাধিকারী হ'তে পারবে। তবে একটা কথা। অর্ডার বিলটা যদি কোন রকমে হারিয়ে যায় বা চুরি যায়, আর কেউ সেটায় প্রাপকের নাম জালদস্তখত করে নির্দ্দোষ তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রী করে, তা'হলে নির্দ্দোষ ক্রেতা বিলটার ওপর পাকা স্বত্বই পেয়ে যাবে।

স্থানভেদে রূপান্তর

ব্যবহার গণ্ডীর ব্যাপ্তি অনুসারেও বিলের মধ্যে একটা শ্রেণী-বিভাগ করা হয়ে থাকে। আদেষ্টা এবং আদিষ্ট যদি এক রাষ্ট্রীয় সীমানায় একই গভর্ণমেন্টের প্রজা হয়,—সে ক্ষেত্রে বিলটাকে বলা হয় 'ইনল্যাণ্ড বিল' অর্থাৎ দেশী বরাতচিঠি। এরা বিভিন্ন গভর্ণমেন্টের

প্রজা হলে বিলটাকে 'ফর্‌এন বিল' বা পরদেশী বিল বলা হয়ে থাকে। উভয়েব মধ্যে যে তফাৎ তা বিলগুলির কায়দা দেখলেই চোখে পড়ে। পরদেশী বিলের বেলায় একসঙ্গে তিন প্রস্থ বিল লেখা হ'য়ে থাকে। তাদের মোসাবিদার মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই,—কেবল অবস্থা বৈগুণ্যে যেটুকু অদলবদল করে লেখা দরকার, তাই করা হয়ে থাকে। পরদেশী বিলের হারিয়ে যাবার বা নষ্ট হ'বার ভয় থাকে খুব। যে ডাকজাহাজে বিল পাঠানো হবে সেটা মাঝ সমুদ্রে ডুবেও ত যেতে পারে; তা হ'লে ত বিলটার পাত্তাও পাওয়া যাবে না। এরকম বিপত্তি সাম্‌লানোর জন্তই পরদেশী বিলগুলি তিন প্রস্থে লেখা হয়ে থাকে। আগে পাঠানো হয় প্রথম প্রস্থ, তারপর পৃথক ডাকে বা জাহাজে দ্বিতীয় প্রস্থ বিল পাঠানো হয়, সেটার পরও আবার তৃতীয় প্রস্থ বিল পাঠানো দস্তর। সবগুলির মোসাবিদা প্রায় একই ধরণের,—অর্থাৎ যে নমুনা দেওয়া হ'য়েছে সেই নমুনাসই; একটু আধটু যা তফাৎ থাকে, সেটা খুব জটিল ব্যাপার কিছু নয়। প্রথম প্রস্থে বিলটার ওপব 'বিলেব পয়লা দফা', দ্বিতীয় প্রস্থে 'বিলের দ্বিতীয় দফা', শেষেরটায় বিলের 'তৃতীয় দফা',—এমনি সব উল্লেখ থাকে। পয়লা দফা আদিষ্টের কাছে না পৌঁছালে দ্বিতীয় দফা, বা দ্বিতীয় দফা না পৌঁছালে তৃতীয় দফার ওপরই টাকা দেবার নিয়ম কায়েম করা হয়েছে। উদ্দেশ্য বিলমাফিক টাকাটা দেওয়া—তা প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় যে দফাই গিয়ে আদিষ্টের কাছে পৌঁছাক না কেন।

আদায়যোগে রকম-ফের

ওপরে বিলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, তার মধ্যে বিলের মূল্য আদায়ের সময় নিরূপণ করে দেওয়া থাকবে। এই মূল্য আদায়ের

সময় হিসেবেও বিলগুলিকে দুটী পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। তার একশ্রেণীকে বলা হয় 'সাইট' বা দর্শনী বিল,—আর এক শ্রেণীর নাম হ'ল 'ইউসান্স' বা মুদ্দতি বিল। দর্শনী বিল যথাস্থানে পৌঁছাবার পর আদিষ্ট পক্ষকে দর্শানোমাত্র বা তার কাছে দাবীমাত্র সে বিলের মূল্য বুঝিয়ে দেয়। মুদ্দতি বিলের মধ্যে মূল্য আদায়ের জন্য একটা ভবিষ্যৎ সময় উল্লেখ করা থাকে। সে সময়টা বিলের আদেষ্টা এবং আদিষ্ট পক্ষের চুক্তিমূলক বন্দোবস্ত অনুসারেই ধার্য্য হ'য়ে থাকে; তবে সাধারণতঃ তিনচার মাসের বেশী সময় দেওয়া হয় না।

বিল বনাম চেক

এই প্রসঙ্গে বিল আর 'চেক'এর মধ্যে তফাৎটা একটু যাচাই করে নেওয়া ভাল। 'চেক' ও একটা আদেশপত্র ছাড়া আর কিছু নয়। আমানতকারী হ'ল আদেষ্টা,—চেক লিখতে সে ব্যাঙ্ককে এই আদেশ দেয়, যেন তার নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রাপককে ব্যাঙ্ক নির্দ্ধারিত পরিমাণ টাকা দিয়ে দেয়। আপাতঃদৃষ্টে এই দুই প্রকার আদেশপত্রের সাম্যই চোখে পড়ে। দুটোতেই আদেষ্টা, আদিষ্ট এবং প্রাপক তিনপক্ষ বর্ত্তমান। দুটোতেই নির্দ্ধারিত পরিমাণ টাকার অঙ্ক থাকা চাই। এই সমতা সত্বেও উভয়ের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তা উপেক্ষণীয় নয়। চেক কেবল ব্যাঙ্কের ওপরই টানা চল্‌তে পারে, কিন্তু বিলের বেলায় কোন বাঁধাবাধি নেই,—যে কোন ব্যক্তি, সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান বিলের আদিষ্ট-পক্ষ হ'তে পারে। তারপর 'চেক'এর টাকা অনতিকালমধ্যে দাবীমাত্র দেয়,—প্রাপক চেক্‌টা পাওয়া মাত্রই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে চেক্‌মাফিক টাকাটা আদায় করে নিতে চাইলে

ব্যাঙ্ক তা দিতে বাধ্য। বিল হ'ল একটা সময় সাপেক্ষ আদেশপত্র—তার বেলায় টাকা দেবার জন্য একমাস, দু'মাস, কি তিনমাস, এমনি একটা নির্দ্ধারিত সময়ের মেয়াদ থাকতে পারে।

বিল বনাম হ্যাণ্ডনোট

যাঁহা বিল এবং চেক, তাঁহা বিল এবং হ্যাণ্ডনোট। দুইয়ের মধ্যেই মিলও আছে, গরমিলও আছে। মিল হ'ল এই যে, এই দুই প্রকার দলিলই সময়-সাপেক্ষ হতে পারে। গরমিলটা কিছু বেশী। বিল একটা আদেশ সূচনা করে,—হ্যাণ্ডনোট একটা প্রতিজ্ঞাপত্র ছাড়া আর কিছু নয়। বিলের জন্য তিনটা পৃথক পক্ষ চাই,—হ্যাণ্ডনোটে দুই পক্ষই যথেষ্ট,—তার একজন হ'ল প্রতিজ্ঞাতা, অপর প্রতিজ্ঞাত (পাওনাদার)। কোন কোন ক্ষেত্রে এ বিষয়ে চেক এবং বিলের সঙ্গে হ্যাণ্ডনোটের তফাৎটা চোখে পড়ে না। চেক এবং বিলের মধ্যে হয়ত শুধু আদেষ্টা এবং আদিষ্টের নামই থাকে,—প্রাপক হিসেবে হয়ত কোন পৃথক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা থাকে না। এমতাবস্থায় একটু ভাল করে দেখলেই চোখে পড়বে যে, সে সব বিল কিংবা 'চেক'এ আদেষ্টাই হয়ত খোদ প্রাপক হিসেবে নিজেকে জ্ঞাপন করেছে। এক ব্যক্তি হ'লেও আদেষ্টা এ রকম ক্ষেত্রে প্রাপক হিসেবে বর্ত্তমান রয়েছে। ব্যক্তি দুটো হ'লেও পক্ষ তিনটাই আছে বুঝতে হবে।

চেক ও বিলের সঙ্গে হ্যাণ্ডনোটএর আর একটা প্রভেদ আছে, তা' দেখবামাত্র সমঝে নেওয়া চাই। সবগুলিই ঋণ-সূচক দলিল। গচ্ছিত টাকার জন্য ব্যাঙ্ক আমানতকারীর কাছে ঋণী,—তাই আমানতকারী চেক লিখে ব্যাঙ্ককে টাকা দেবার হুকুম দেয়। বিলএর বেলায়ও আদেষ্টা আদিষ্টের, সত্য বা মিথ্যা যা'ই হোক, একটা ঋণ-সূচক দায়স্বীকার

পেয়ে তার ওপর বিলমাফিক টাকা দেবার হুকুম জারী করে। চেক এবং বিল উভয়ক্ষেত্রেই আদেষ্টা অর্থাৎ পত্রলেখক পাওনাদার বুঝতে হবে। হ্যাণ্ডনোটের বেলায় কিন্তু ঠিক এর উল্টো ব্যাপার ঘটে থাকে। এখানে আদেশের কোন ব্যাপার নেই,—লেখক নিজেই দেনদার হিসেবে প্রতিজ্ঞাত পক্ষের কাছে সময় বিশেষে বা সময় নির্ব্বিশেষে দেয় বলে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকার ঋণ স্বীকার করে নেয়। সে যাই হোক, আসলে কিন্তু সবগুলিই ঋণসূচক দলিল,—তা সে যে পক্ষের কাছে থেকেই প্রাপ্য হোক না কেন। প্রত্যেকটাতেই একপক্ষ পাওনাদার ও আর এক পক্ষ দেনদার রূপে বর্ত্তমান আছে। চেক এবং বিলএর বেলায় আদিষ্টপক্ষ দেনদার, আদেষ্টা পাওনাদার; তবে সে তার পাওনার দাবী প্রাপককে প্রদান করেছে বুঝতে হ'বে। হ্যাণ্ডনোটের বেলায় প্রতিজ্ঞাতা দেনদার, অপরপক্ষ পাওনাদার। ঋণের টাকাটা অল্পবিস্তর সময়সাপেক্ষভাবে প্রাপ্য হ'লেও দেনদারপক্ষ ঋণ অস্বীকার না করলে, তা নগদ টাকার সামিল হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে। দেনদারপক্ষ ঋণ অস্বীকার করলেই যে দলিল-মাফিক টাকাটা মারা যাবে, তা'ও নয়। আইন তার জন্যও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেছে। চেক এবং বিলএর আদিষ্টপক্ষ ঋণ অস্বীকার করলে বা দেউলিয়া হ'য়ে গেলে, প্রাপক আদেষ্টার কাছ থেকেই টাকাটা আদায় করে নিতে পারে। হ্যাণ্ডনোটের বেলায়ও প্রতিজ্ঞাতা একেবারে দেউলিয়া না হ'য়ে পড়লে টাকা আদায় হবেই। ব্যবসা জগতে এই সব দলিলের টাকা যাতে ঠিক ঠিক সময় দেওয়া হয়, সে দিকে সবারই খুব কড়া নজর থাকে। মহাজনের বাজার-সম্ভ্রম নির্ভর করে এরই ওপর,—কাজেই এ সব দলিলমাফিক টাকা পেতে গোলমাল বড় একটা হয় না। তবে জাল জোচ্চুরি সব ব্যাপারেই আছে,

কিছু কম আর বেশী, এই যা তফাৎ। ব্যবসা জগতে এই দলিলগুলির কদর যে জন্ম বেড়েছে সেটা হচ্ছে এই যে, এর সবগুলিই পিছসই করে হস্তান্তরিত করা চলে। তাতে একই দলিল হয়ত কতকগুলি দেনাপাওনা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে,—দলিলের পাওনাদার অপরকে টাকাটা দেয় বলে দস্তখত করলেই হ'ল।

বিল বনাম হুণ্ডী

বিল কথাটা ইংরেজি হলেও ইংরেজেরাই যে এই ধরণের দলিল এ দেশে আমদানি করেছে, তা নয়। আর এর ব্যবহারও খুব আধুনিক ব্যাপার নয়। য়ুরোপেই এর ব্যবহার স্বরু হয়েছে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে,—তখনকার ফ্লোরেন্স এবং ভিনিসএর ব্যবসায়ীরাই হ'ল এর আবিষ্কর্ত্তা। এ দেশেও বিলএর অনুরূপ দলিল হুণ্ডীর ব্যবহার অনেক কাল থেকে চলে আসছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে হুণ্ডীকে দেশী বিল বলা যেতে পারে। স্থান কাল পাত্রের প্রভেদ অনুসারে বিল এবং হুণ্ডীর মোসাবিদায় একটু প্রভেদ আছে, —তবে তাৎপর্য্য হিসেবে সেটা উপেক্ষণীয়। নীচে দেশী হুণ্ডীর যে নমুনাটা দেওয়া হ'ল সেটা পর্য্যবেক্ষণ করলেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে।

শ্রীগণেশজী

শ্রীকিষণ দাস শঙ্করনারায়ণ

স্ট্যাম্প

নং—

সিদ্ধ শ্রী পাটনা-সহর শুভস্থানেক ভাই শ্রীতুলসী দাসজী রামদাস যোগ শ্রী কলকত্তা বন্দরসে লিখী শ্রীকিষণদাস শঙ্করনারায়ণকা রাম রাম

বঞ্চনা। অপরঞ্চ হুণ্ডী কিতা ১ রু ২,০০০৲ অখরে রুপয়া দো হজারকী নীমে রুপয়া এক হাজারীকা দুনা পুরা যহাঁ রকৃথে ভাই লালরাম শোভারাম পাস মিতী জেট বদী ১৩ তেরস থী দিন ৬১ একষট্ পীছে সাহযোগ রুপয়া হুণ্ডী-কোম্পনী চলনকা দেনা। মিতী জেট বদী ১৩ তেরস বৃহস্পতিবার, সং ১৯৮০।

দঃ শ্রীকিষণদাস শঙ্করনারায়ণ

অর্থাৎ

সুন্দর শুভস্থান সিদ্ধিদাতা পাটনা সহরের শ্রীতুলসীদাসজী রামদাসকে কলিকাতা বন্দর হইতে শ্রীকিষণদাস শঙ্করনারায়ণ তাহাদের অভিনন্দন জানাইতেছে। তারপর আমরা (অর্থাৎ শ্রীকিষণদাস শঙ্করনারায়ণ) তোমাদের (অর্থাৎ শ্রীতুলসীদাসজী রামদাস) উপর এই সূত্রে এক কেতা হুণ্ডী লিখিতেছি ২,০০০৲ টাকার জন্য, যার অর্দ্ধেক টাকার পরিমাণ হইল এক হাজার টাকা। হুণ্ডীর টাকার প্রাপক হইবে ভাই লালরাম শোভারাম। হুণ্ডীর টাকা ত্রয়োদশ জ্যৈষ্ঠ বদী হইতে ৬১ দিন পরে হুণ্ডীর মান্যবর অধিকারীকে কোম্পানীর সিক্কায় বুঝাইয়া দিবে। তাং ত্রয়োদশ জ্যৈষ্ঠ বদী, সম্বৎ ১৯৮০।

(অধিকার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর)
দস্তখত—শ্রীকিষণদাস শঙ্করনারায়ণ।

উক্ত হুণ্ডীতে আদেষ্টা দঃ শ্রীকিষণদাস শঙ্করনারায়ণ, আদিষ্টপক্ষ শ্রীতুলসীদাসজী রামদাস, প্রাপক লালরাম শোভারাম। মোহমুদ্গরের দেশে দলিলেও গণেশ এবং রাম রাম ঢুকেছে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? সে যাই হোক বিল এবং হুণ্ডীর তাৎপর্য্যটা যে একই, তা এ থেকে

বেশ বোঝা যাবে। বিলের মত দেশী হুণ্ডীর মধ্যেও দর্শনী এবং মুদ্দতি বলে দুটো বিভাগ আছে,—আর সত্যি করে ভিন্ন দেশে হলেও এই দু' রকম দলিলের সৃষ্টিও হয়েছে একই কারণে।

বরাত চিঠির জন্মকথা

কারণটা আর কিছুই নয়, কেবল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নগদ টাকাকড়ি পাঠাবার বিপত্তি এড়িয়ে যাবার একটা কৌশল বাতলানো মাত্র। দেশে দেশে গভর্ণমেণ্টের কড়া শাসন এক দিনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। এমনও দিন গেছে যখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে টাকা পাঠাতেও পাইক পেয়াদার দরকার হ'ত। চোর ডাকাতের লুটতরাজের সম্ভাবনা সব দেশেই বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। অথচ টাকাকড়ি চালান না দিতে পারলে ব্যবসা বাণিজ্যই বা চলবে কি করে? সমস্যাটা যখন এই রূপ ধারণ করল, তখন তার মীমাংসাও হয়ে গেল এই বিলেরই কেরামতিতে। এর সাহায্যেই নগদ টাকাকড়ি স্থানান্তরিত না করেও অবাধে ব্যবসা বাণিজ্য চলেছে। কেমন করে তা সম্ভব হয়েছে, তার মর্ম্ম নীচের কল্পিত দৃষ্টান্ত পড়লেই বোঝা যাবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়টার কথা ভাবা যাক্। সে সময় মোগল শাসনে ভাঙ্গন ধরেছে, কোম্পানীও খুঁটি গেড়ে বসে নি। রেলের লাইন পাতা হয় নি বটে, কিন্তু পাটনার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্বন্ধ আছে। এমনি অবস্থায় মুর্শিদাবাদের দয়ারাম শেঠ পাটনা থেকে অড়হর আমদানী করে, আর পাটনার লছমী-নারায়ণ তেওয়ারীর মুন্সী মুর্শিদাবাদে তসর খরিদ করে। বিল ফিলের ব্যাপার নাই, কেনাবেচা সব নগদা-নগদিতে চলে। দয়ারামের

মুন্সী তার বজরায় লগি ঠেলে পাটনায় যান, সঙ্গে ২।৪ জন পাইক দিনে দু'বার করে তাদের ভোজালি শানায়,—আর শেঠজী হয়ত গোটা পথটাই ঘন ঘন কোমরের পুঁটলিটার স্পর্শ অনুভব করেন, ঘুমের ঘোরে আৎকে ওঠেন কিংবা জাগ্রত অবস্থায় দুর্গা নাম জপ করতে করতে দীর্ঘপথ পাল্লা দেন। পথে দু'চারটা মানত করেন নিশ্চয়ই,—গন্তব্যস্থানে পৌছালেই মনে করেন সেবারকার মত পরমায়ুটা থেকে গেল। তেওয়ারিজীর মুন্সীর অবস্থাও এর চাইতে ভাল নয়,—তফাৎ এই যে, শুধু প্রথা নেই বলেই তিনি হয়ত মানত কিছু করেন না, আর দুর্গার বদলে তিনি হয়ত রাম রাম জপ করেই কাজ সেরে নেন। তবু এমনি করেই ব্যবসা চলে। কথায় বলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"—এক পয়সায় তিন পয়সা লাভ করতে পারলে অমন দু'চারটা বজরা লুট ত দূরের কথা, তলিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি ?

তবু ক্ষতিটা এড়াতে পারলে আর সাধ করে কে তা ঘাড়ে তুলে নিতে চায় ? তাইতেই এই বরাতচিঠির জন্ম হ'ল। এর সহায়তায় যে কেমন করে লেনদেন করা সম্ভব হ'ত, এখন তাই বোঝবার চেষ্টা করা যাক। দয়ারামের মুন্সী এবার পাটনায় 'মিরচাই' খরিদ করবে,—সঙ্গে সে কিছু টাকাকড়ি নেয় নি, শুধু একটা হুণ্ডীর খাতাই তার সম্বল ; হাজার টাকার লঙ্কা কেনবার পর তাকে দাম দিতে হবে। টাকাটা যোগাড় করবার জন্য সে একটা হুণ্ডী লিখল মুর্শিদাবাদের দয়ারাম শেঠের গদির ওপর। হুণ্ডীর মর্ম আর কিছুই নয়, কেবল হাজার টাকা পত্রবাহককে দেবার জন্য দয়ারামের ওপর একটা আদেশ (বা অনুরোধ ?) তাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হুণ্ডীটা লিখে মুন্সিজী তা বিক্রী করতে চাইবে। কেনবার লোক জুটে যাবে, আমাদের পূর্ব্বকথিত লছমীনারায়ণ

তেওয়ারী। সে মুর্শিদাবাদে তসর কেনে,—তার জন্য তাকে নগদ টাকা পাঠাতে হয়, আর সে জন্য আনুসঙ্গিক সব বিপদই তাকে নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে হয়। এ বছরও হয়ত সে হাজার টাকার তসর কিনবে, কিন্তু এবার তার নগদ টাকা পাঠাবার দরকার হবে না। দয়ারামের মুন্সীর হুণ্ডীটা কিনে নিলেই ত তার কাজ চ'লতে পারে। মুন্সীজী হুণ্ডীটার মধ্যে প্রাপক হিসেবে লছমীনারায়ণের মুন্সীর নামটা উল্লেখ করে দেবে। ফলে হুণ্ডীটা বিক্রী করে 'মিরচাই' কেনবার হাজার টাকা দয়ারামের মুন্সী লছমীনারায়ণের কাছ থেকেই পেয়ে যাবে। লছমীনারায়ণের মুন্সীর এবার মুর্শিদাবাদে তসর কেনবার জন্য সেই হুণ্ডীটাই হ'বে সম্বল। তার তসর কেনবার হাজার টাকা হুণ্ডীটা ভাঙ্গিয়েই সে দয়ারামের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারবে। কেনাবেচা, ব্যবসা সমানই চলল, অথচ কোথাও নগদ টাকাকড়ি পাঠাবার দরকার হ'ল না। হুণ্ডী বা বিলএর এই একটা মস্ত সুবিধে, এরই জন্য এসব দলিলের উদ্ভব হ'য়েছে।

এ ত গেল বিল বা হুণ্ডীর জন্ম-কথা। তার কারণও না হয় বোঝা গেল। কিন্তু এখনও যে এসব বিলের ব্যবহার চলছে, তার কারণ কি? এখন ত আর এ কথা বলা চলে না যে, লুটতরাজের ভয়েই লোকে নগদ টাকা ব্যবহার না করে বিল ব্যবহার করছে। এখন অনেক দেশেই সুনিয়ন্ত্রিত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'বার ফলে এ রকম আশঙ্কা করবার কোনই কারণ থাকতে পারে না। তবে বিলের ব্যবহার চলছে কেন? তার কারণ এই যে, নগদ টাকার বদলে এরকম দলিলের সহায়তায় লেনদেন চালানো এখন খুবই অনায়াসসাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়েছে, আর তাতে খরচও কিছু কম হ'য়ে থাকে। কেমন করে এই ব্যয়সংক্ষেপ করা সম্ভব হয়, তা একটা

পরদেশী বিল দিয়েই বোঝানো সহজ হ'বে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া এই দুটি দেশের কথা ভাবা যাক। এই দুই দেশেই একই রকম মুদ্রা ব্যবহৃত হচ্ছে। উভয়েরই চলৎসিক্কা হচ্ছে 'পাউণ্ড'। এদের মধ্যে যে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য চলছে তার টাকা যোগাবার জন্য এরা পরস্পরের কাছ থেকে প্রাপ্য বিলের ওপর নির্ভর করে। লণ্ডনের মিঃ হফ্‌ম্যান অষ্ট্রেলিয়ার মিঃ হ্যারির কাছ থেকে ভেড়ার মাংস আমদানি করে, আর লণ্ডনের মিঃ ষ্ট্যান্‌লি অষ্ট্রেলিয়ায় তার এজেণ্ট মিঃ ডিকের নামে বস্ত্র রপ্তানি করে। শুধু দৃষ্টান্তের খাতিরেই মনে করা যাক্ যে, মিঃ ষ্ট্যান্‌লি মিঃ ডিক্‌কে একশ' পাউণ্ডের লংক্লথ পাঠিয়েছে, আর মিঃ হ্যারিও একশ' পাউণ্ডের মাংস পাঠিয়েছে লণ্ডনের মিঃ হফ্‌ম্যানকে। এখন এদের দেনা পাওনা মেটানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখ্‌তে হ'বে যে, তার জন্য নগদ টাকা পাঠাতে হ'লেই বা অসুবিধা কি, আর বিল পাঠালেই বা তাতে কি সুবিধে হ'তে পারে। বর্ত্তমান দৃষ্টান্তে যে যে ব্যবস্থা হ'তে পারে, তা এই :—মিঃ ষ্ট্যান্‌লি তার লংক্লথ পাঠিয়ে মিঃ ডিক্‌এর কাছ থেকে দামটা আদায় করতে চাইবে; কাপড়ের চালানটা সেখানে চট্‌ করে বিক্রী হয়ে গেছে, তাও না হয় ধরে নেওয়া গেল। কিন্তু টাকাটা বিলেতে আনা যাবে কি করে? পোষ্টাল অর্ডার করে আনানো যেতে পারে বটে, কিন্তু তার জন্য একটা খরচা আছে ত! কিংবা ধাতুমুদ্রা পেলে হয়ত ষ্টীমারেও তা ইন্‌সিওর করে পাঠানো সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তার জন্যও খরচ আছে। খরচ যাই হোক, সেটা না দিলে আনানো আদৌ সম্ভব হবে কি করে? এমনি যদি হয় যে অষ্ট্রেলিয়া থেকে বিলেতে একশ' পাউণ্ড পাঠাতে পোষ্টাল

অর্ডার বা ষ্টীমারের ইন্‌সিওর খরচা এক পাউণ্ড লাগে, তবে প্রস্তাবিত উপায়ে খরচ মিটিয়ে বিলেতে যে টাকা এসে পৌছাবে তার পরিমাণ হবে ৯৯ পাউণ্ড। দৃষ্টান্তটা নিছক কাল্পনিক হ'লেও বিলের সহায়তা না নিলে ব্যাপারটা যে এমনি গিয়ে দাঁড়াবে তাতে সন্দেহ নেই।

এখন বিলের ব্যবহারে কি সুবিধে হ'তে পারে তাই যাচাই করে দেখা যাক। ওপরের দৃষ্টান্তে মিঃ ষ্ট্যান্‌লি নিজেই টাকাটা আনাবার বন্দোবস্ত না করে শুধু মিঃ ডিক্‌কে আদেশ করে যদি একটা বিল লেখে, আর সেই বিলটা যদি লণ্ডন সহরেই বিক্রী করা সম্ভব হয়, তা'হলে অনেক ঝঞ্ঝাটের হাত থেকেই সে নিষ্কৃতি পেতে পারে। কিন্তু কথা হ'ল, সে বিলটা কিনবে কে! কেন, কেনবার জন্য ত মিঃ হফ্‌ম্যানই রয়েছে; তাকে ত মাংসের দাম মিটিয়ে দিতে হবে; অষ্ট্রেলিয়ার মিঃ হ্যারির কাছে ত তার একশ' পাউণ্ড পাঠানো চাই। এর পরেই প্রশ্ন উঠবে যে, ষ্ট্যান্‌লির একশ' পাউণ্ডের বিলটা বিক্রী হবে কত দামে।—এই খানে একটা কথা সম্বন্ধে নেওয়া দরকার। ষ্ট্যান্‌লি যে বিলটা লিখবে তার মূল্য আদায় হবে অষ্ট্রেলিয়ার মিঃ ডিক্‌এর কাছ থেকে। অষ্ট্রেলিয়ায় বসে মিঃ ডিক্‌ তার কাছ থেকে প্রাপ্য বিলের জন্য একশ' পাউণ্ড গুণে দিলেও তা যে লণ্ডনে পৌছাতে কি রকম করে নিরানব্বই পাউণ্ডে এসে দাঁড়ায়, তা আমরা দেখেছি। তবে তখন বিলমারফৎ টাকা পাঠাবার কথাটা ধরা হয় নি। এরপর যদি বিলের সাহায্য নেওয়া হয়, তা হ'লে তারও বিনিময় মূল্য নির্দ্ধারিত হবে এই প্রেরণ-খরচার অনুপাতেই। মিঃ ষ্ট্যান্‌লি যখন তার বিলটা লণ্ডনে বেচ্‌তে চাইবে, তখন তার ন্যূনতম মূল্য নির্দ্ধারিত হবে নিরানব্বই

পাউণ্ডে। তার কম সে নিতে রাজী হবে না এই জন্য যে, সোজাসুজি অষ্ট্রেলিয়া থেকেই যদি সে টাকাটা আনাবার বন্দোবস্ত করে, তবে সমস্ত খরচা মিটিয়েও সে লণ্ডনে নিরানব্বুই পাউণ্ড আনাতে পারে। এখন মিঃ হফ্‌ম্যান এই বিলটার কত দাম দিতে রাজী হ'তে পারে তাই হিসেব করে দেখা যাক। তাকে মাংসের দাম বাবদ অষ্ট্রেলিয়ায় মিঃ হ্যারির কাছে পাঠাতে হবে একশ' পাউণ্ড। কিন্তু তা পাঠাতে গেলেই ত একটা খরচা আছে। সে খরচের পরিমাণও আমরা দেখেছি একশ' পাউণ্ডে এক পাউণ্ড লাগে,—অবশ্য যদি পোষ্টাল অর্ডার বা ইন্সিওর করে পাঠাতে হয়। অন্য উপায় কিছু না থাকলে মিঃ হফ্‌ম্যানকে এই এক পাউণ্ড বেশী খরচ করেই তার মাংসের দাম একশ' পাউণ্ড অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠাতে হ'বে। এখন যদি সে মিঃ ষ্ট্যান্‌লির একশ' পাউণ্ডের বিলটা পায় তবে সেটা কিনে নিয়েও ত সে টাকাটা পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে পারে, শুধু বিলটার প্রাপক হিসেবে মিঃ হ্যারির নামটা বসিয়ে বিলটা তার কাছে পাঠিয়ে দিলেই হ'ল। টাকাটা সেই মিঃ ডিক্‌এর কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারবে।

এমনি অবস্থায় লণ্ডনে মিঃ ষ্ট্যান্‌লির বিলের উচ্চতম মূল্য নির্দ্ধারিত হবে একশত এক পাউণ্ডে, কারণ অষ্ট্রেলিয়ায় একশ পাউণ্ড পাঠাতে গিয়ে মিঃ হফ্‌ম্যানের সত্যি করে 'একশ' এক পাউণ্ডই খরচা হ'তে পারত। তা হ'লে দেখা গেল যে, ষ্ট্যান্‌লির অষ্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্য একশ পাউণ্ড মূল্যের বিলটার লণ্ডনে ন্যূনতম মূল্য হ'তে পারে নিরানব্বুই পাউণ্ড; আর তার উচ্চতম মূল্য গিয়ে দাঁড়াতে পারে 'একশ' এক পাউণ্ডে। ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা বিলের ক্রেতা বিক্রেতার টান-যোগানের ওপর নির্ভর করে। সে

সম্বন্ধে স্পষ্ট করে আগাম কিছু বলা সম্ভব না হ'লেও এ কথা ঠিক যে, প্রকৃত বিক্রয়-মূল্য ন্যূনতম ধাপে এসে নামবে না, বা উচ্চতম ধাপে গিয়েও চড়বে না। শেষের ব্যাপারটা সম্ভব হ'বে না এই জন্য যে, তা'হলে বিল-ক্রেতা দেখবে যে সোজাসুজি টাকা পাঠালেও তার সমানই খরচ পড়ে। কার্য্যতঃ সর্ব্বদাই বিলবিক্রয়ের হার এই দুই চরম সীমার মধ্যে কোন জায়গায় এসে স্থিরীকৃত হ'বে। তাতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষেরই লাভ। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে যদি ষ্ট্যান্‌লির বিলটার দাম সাড়ে নিরানব্বুই পাউণ্ডে এসে দাঁড়ায়, তা'হলে ষ্ট্যান্‌লিরও লাভ, হফ্‌ম্যানেরও লাভ। 'বিল অব্‌ এক্সচেঞ্জ' বা বরাত-চিঠির ব্যবহার যে আজ পর্য্যন্তও টিঁকে আছে তা এই লাভালাভেরই দরুণ,—এর আর কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নেই।

ওপরে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল, তাতে দেখানো হয়েছে যে আমদানিকার সোজাসুজি রপ্তানিকারের কাছ থেকে বিল কিনে টাকা পাঠাচ্ছে, —কার্য্যতঃ তা সম্ভব হয় না। গোটা দেশে কে কোথায় মাল রপ্তানি করেছে, আমদানিকারের পক্ষে তা খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। রপ্তানিকারও জানে না যে, দেশে কোথায় কোন আমদানিকার অন্যত্র টাকা পাঠাবার জন্য উৎসুক হ'য়ে আছে। এদের এই অসুবিধা মেটাচ্ছে ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের খবর এবং ঠিকানা আমদানিকার এবং রপ্তানিকার উভয়েই বেশ ভাল করে জানে। ব্যাঙ্ক রপ্তানিকারের কাছ থেকে বিল কিনে নেয়,—এর ফলে তার পরদেশী শাখায় বিলের মূল্য আদায় হয় ও টাকার পুঁজি বাড়ে; কিন্তু রপ্তানিকারকে টাকা দিয়ে যেখানে ব্যাঙ্ক বিল কেনে সেখানে তার টাকার পুঁজি ফুরিয়ে আসে। তারপর আমদানিকার আসে বিল কিনে টাকা পাঠাবার জন্য। রপ্তানিকারের বিলটাই হয় ত ব্যাঙ্ক তার কাছে

বেচে না। তাতেই বা কি! রপ্তানিকারের বিলের আদায় ত তার বিদেশী শাখার পুঁজি বাড়াবে; তারই জোরে সে নিজেই তার শাখাঅফিসের ওপর একটা বিল লিখে আমদানিকারের কাছে বিক্রী করে দেয়,—তারই কোন ঈপ্সিত লোককে প্রাপক নিরূপণ করে। এমনি করে ব্যাঙ্ক আমদানিকার আর রপ্তানিকারের মাঝখানে এসে মধ্যস্থতার কাজ সম্পন্ন করে দিচ্ছে। বিলের ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় পক্ষ আছে বলেই তার কারবার চলছে। কেনা বিল সে কত দামে বেচবে, তাও একেবারে তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়,—সেও নির্ভর করে ক্রেতা বিক্রেতাদের টান-যোগানের ওপর। এই মাধ্যমিকতার জন্য ব্যাঙ্ক লাভ অর্জ্জন করে দু'পক্ষ থেকেই। বিল কেনবার সময় সে কিছু সস্তায় কেনে,—বেচে কিছু চড়া দামে। অবশ্য খরিদ বা বিক্রয় মূল্য কোনটাই পূর্ব্বকথিত ন্যূনতম বা ঊর্দ্ধতম সীমানা অতিক্রম করে না। এই বিল কেনাবেচার মধ্য দিয়েই ব্যাঙ্ক দুটো দেশের মুদ্রা বিনিময়ের বাজার-চল্‌তি হার নির্ণয় করে দেয়। ধাতু হিসেবে এই মুদ্রাগুলির মধ্যে একটা স্বাভাবিক পরিমাণ সম্বন্ধ থাকলেও, লেনদেনের ব্যাপারে সেটাই যে সব সময় মেনে চলা হয়, তা নয়। অষ্ট্রেলিয়ার পাউণ্ড সোনার পরিমাণ হিসেবে লণ্ডনের পাউণ্ডের সমান, অথচ তারই একশ' পাউণ্ড কিনতে লণ্ডনে মিঃ হফ্‌ম্যান বিলাতী পাউণ্ডের একশ এক পাউণ্ড খরচ করতেও রাজী হ'তে পারত। ষ্ট্যান্‌লির বিল বাবদ প্রাপ্য পাউণ্ড ত অষ্ট্রেলিয়ার পাউণ্ড। সত্যি-করেই যদি মিঃ হফ্‌ম্যান ষ্ট্যান্‌লির বিলের জন্য একশ' এক পাউণ্ড দিত তা'হলে বিলাতী পাউণ্ডের বিনিময়-হার দাঁড়াত এমনি:—বিলাতী ১ পাউণ্ড = ১০০/১০১ অষ্ট্রেলিয়ান্ পাউণ্ড। ব্যাঙ্ক-মহলে মুদ্রা বিনিময়ের হিসেব চলৎ-সিক্কা মুদ্রার অনুপাতেই করা হয়ে থাকে,—একথাটা মনে রাখা দরকার।

কনফার্মড্ ব্যাঙ্কার্স্ ক্রেডিট্

ব্যাঙ্কের দায়-স্বীকার

পরদেশী বিলকে বাজার-চলন অর্থাৎ বিক্রয়-যোগ্য করে তোলবার জন্য অনেক সময় ব্যাঙ্কের দায়-স্বীকার দাবী করা হয়। ব্যাপারটা সহজ করে বোঝবার জন্য একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা দরকার। একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। কলকাতার মহাজন গঙ্গারাম ঝুনঝুন্ওয়ালা ল্যাঙ্কাশিয়ার থেকে এক চালান ধুতি আনাবে, মতলব এটেছে। তার প্রকাণ্ড গদি, বনিয়াদি কারবার,—সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের আমানতি হিসেবে লক্ষটাকা তার মজুদ আছেই। ল্যাঙ্কাশিয়ারের বিখ্যাত রপ্তানিকার 'ফারগুসন্ লয়েড এণ্ড কোং' এর সঙ্গে এই ধুতি চালান ব্যাপার নিয়েই সে অনেক চিঠিপত্র চালিয়েছে। দাম-দস্তুর, জাহাজ বাছাই, মাল ইন্সিওর, সব সম্বন্ধেই একটা পাকাপাকি চুক্তিও হ'য়ে গেছে। ঝুনঝুন্ওয়ালা শেষে লিখল, 'এবার মাল পাঠাও', কিন্তু লয়েড কোম্পানী চিঠির জবাব দিলে, "মাল ত পাঠাতেই পারি, কিন্তু ব্যাঙ্কের দায়-স্বীকার চাই"। ব্যাঙ্কের দায়-স্বীকার,—কি রকম? রকমটা জটিল কিছু নয়, ঝুনঝুনওয়ালার বিলেতে বাজার-সম্ভ্রম নেই, তাকে আদেশ করে কোন বিল লিখলে কোন বিলাতী ব্যাঙ্কই তা কিনতে চাইবে না। রপ্তানিকার চায় যে সে মাল পাঠিয়েই একটা বিল লিখে সেটা কোন ব্যাঙ্কের কাছে ভাঙিয়ে নেবে। সময় সাপেক্ষ বিলের মেয়াদ সম্পূর্ণ হবার তারিখ পর্য্যন্ত সে মালের টাকাটা ফেলে রাখতে পারে না, কারণ লগ্নী কারবার ত তার পেশা নয়! তাই সে চালানের মূল্য-তালিকা তৈরী করবার সময়ই বিলের

মেয়াদ অনুসারে সম্পূর্ণ প্রাপ্য মূল্যের ওপর সুদটাও যোগ করে নেয়। পরে ব্যাঙ্কের কাছে যখন বিলটা ভাঙানো হয়, তখন ব্যাঙ্ক বিলের ওপর ধার্য্য বাটা হিসেবে সুদটা কেটে নেয়। ফলে রপ্তানিকার টাকাটা তখনি পায়,—অথচ সুদ কেটে নেবার ফলে লোকসানও তার কিছু হয় না। বিল ভাঙানোর তাৎপর্য্য হ'ল এই যে, রপ্তানিকার ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা পেয়ে ব্যাঙ্ককেই বিলের সম্পূর্ণ মূল্যের প্রাপক হিসেবে নাম নির্দ্দেশ করে দেয়। সুদের টাকাটা প্রকৃত পক্ষে তখন অর্জ্জন করে এই ব্যাঙ্ক। তা সে ন্যায্য ভাবেই দাবী করতে পারে। রপ্তানিকারকে নগদ টাকা ধার ক'রে দিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয়, কতদিনে বিলের মেয়াদ ফুরোবে, আর বিলের টাকাটা বিলের আদিষ্ট-পক্ষের কাছ থেকে আদায় হবে। আদিষ্ট-পক্ষ অর্থাৎ আমদানিকারেরও এতে লোকসান নেই। আমদানি মাল খালাস করে নিয়ে হয়ত সে দু'মাস কি তিনমাস পরে বিলের টাকা দেবে। নগদ টাকা ধার করে নিয়েই যদি তাকে এমনি কারবার চালাতে হ'ত তা'হলেও ত তাকে একটা সুদ দিতেই হ'ত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সে প্রকৃত পক্ষে ধারই পাচ্ছে, না হ'লে যে ব্যাঙ্কের কাছে রপ্তানিকার তার বিল ভাঙায়, সে মেয়াদী বিলটা নিয়ে শুধু শুধু বসে থাকবে কেন? সুদের টাকা ত সে চাইতেই পারে। সুদের দাবীটা তা'হলে সব দিক দিয়েই সমর্থন-যোগ্য বুঝতে হ'বে।

সে যা হোক, আসল কথা হ'ল এই বিলভাঙানোর ব্যাপারটা নিয়েই। বিলটা যাতে ন্যাকালিয়ারে সহজেই ভাঙানো যেতে পারে তার জন্যই র‍্যালেও কোম্পানী ঝুনঝুনওয়ালার কাছে ব্যাঙ্কের দায়-স্বীকার চায়। বিলটা হয় ত ন্যাকালিয়ারে চার্টার্ড ব্যাঙ্কের কাছে নেওয়া [illegible] ভাঙাবার জন্য। ব্যাঙ্ক বলেছে যে, ভারতীয় কোন বিল

ব্যাঙ্কের দায়-স্বীকার থাকলেই তারা ভাঙাবে, নতুবা নয়। কি জানি, শেষ পর্য্যন্ত ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার কাছ থেকে টাকাটা আদায় করা যদি সম্ভব নাই হয়! সে যে মাল খালাস করে তা বেচে ফেলবার পরেই দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাবে না, তার প্রমাণ কি আছে? লয়েড কোম্পানী আর এ ক্ষেত্রে কি করবে,—বাধ্য হয়েই তাকে ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার কাছে কোন ব্যাঙ্কের দায়-স্বীকার দাবী করতে হয়েছে। ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালারও ধুতি চালান না আনলেই নয়, কাজেই সে হাজির হবে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কাছে। সেখানে আমানতি হিসেবে তার লক্ষ টাকা মজুদ আছে, তারই জোরে ব্যাঙ্ককে সে অনুরোধ করবে তার হ'য়ে লয়েড কোম্পানীর বিলের ওপর দায়-স্বীকার করে নিতে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক তার অনুরোধ রক্ষা করবে বটে, কিন্তু অমনি নয়। যে পরিমাণ টাকার জন্ত সে দায়-স্বীকার করবে তার জন্ত ব্যাঙ্ক শতকরা হারে একটা কমিশন আদায় করে নেবে। শেষ পর্য্যন্ত টাকাটা কিন্তু ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার কাছ থেকেই আদায় হ'বে, আর তা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত আমানতের টাকাটা ত ব্যাঙ্কের কাছে জামীনের মতই গচ্ছিত রইল। শুধু দায়-স্বীকারের বিপত্তিটুকু ঘাড়ে করে নেবার জন্তই মাঝখান থেকে এই ব্যাঙ্ক কিছু কমিশন রোজগার করবার সুযোগ পেয়ে যাবে।

এখন দায়-স্বীকারের পদ্ধতিটা কি রকম দেখা যাক। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত হ'য়ে গেলেই লয়েড কোম্পানীর কাছে একটা দায়-স্বীকার পত্র লিখবে। তাতে সে লয়েড কোম্পানীকে জানিয়ে দেবে যে, ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালাকে তারা যে মাল পাঠাবে, তার মূল্য-বাবদ আদায়ী বিলের ওপর ব্যাঙ্ক একটা নির্দ্ধারিত পরিমাণ টাকার জন্ত দায়-স্বীকার করতে বাধ্য থাকবে। সে টাকার পরিমাণ

একাধিক চালানের পক্ষেও যথেষ্ট হতে পারে। সে যা হোক, লয়েড কোম্পানী এবার বিলটা লিখবে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ককে আদিষ্ট-পক্ষ করে। পরে বিলটার সঙ্গে ব্যাঙ্কের দায়-স্বীকার পত্র নিয়ে সে হাজির হবে পূর্ব্বকথিত চার্টার্ড ব্যাঙ্কের ল্যাঙ্কাশিয়ার শাখায়। এবার সে ব্যাঙ্কের বিল ভাঙ্গানো সম্বন্ধে আর কোনই আপত্তি হবে না, কারণ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে, তার দায়-স্বীকার থাকলে টাকা মারা যাবার কোনই আশঙ্কা নেই।

এর পরে যে ব্যাপার ঘটবে তাতে কোন গোলমাল নেই। চার্টার্ড ব্যাঙ্ক বিলটা পাঠাবে তার ক'লকাতার শাখা অফিসে। সেখানে কিছুদিন সেই বিল ফেলে রাখাব পর মেয়াদ ফুরোলেই টাকাটা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া হ'বে। মেয়াদ ফুরোবাব আগেই হয় ত ঝুনঝুনওয়ালা তাব মাল বিক্রী সাবাড করে বিলের টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা করে দেবে, বিলেব দাবী মেটাবার জন্য সত্যি করে ব্যাঙ্কের হয় ত কোন ঝঞ্ঝাটই পোয়াতে হ'বে না।

ক্লিন ক্রেডিট্

সাফাই বিলের দায়

"ক্লিন ক্রেডিট" বা সাফাই বিলের ওপর দায়-স্বীকার করেও কোন কোন ক্ষেত্রে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের পোষকতা করা হ'য়ে থাকে। সাফাই বিলের দায়টা স্বীকার করে আমদানিকার। "কনফার্মড্ ক্রেডিট"এর মত এ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক নিজেই বিলের ওপর দায়-স্বীকার করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় না। উভয়ের মধ্যে প্রভেদটা একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে। ক'লকাতার জয়নুল হুসেন

ডাণ্ডিতে মিঃ রদারমেয়ার সাহেবের কাছে কয়েক শ' মন কাঁচা চামড়া চালান দেবে স্থির করেছে। চামড়াটা বিলেতে পৌঁছানো মাত্রই আমদানিকারের হস্তগত হওয়া দরকার। সেজন্য জাহাজী চালান রসিদ বা মাল খালাস করবার পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিল-পত্র সোজাসুজি রদারমেয়ারএর কাছে পাঠালেই সুবিধে হয়। এ ক্ষেত্রে মিঃ রদারমেয়ারই সাফাই বিল লেখাবার আয়োজন করবে। বিলেতে তার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। সে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার লণ্ডন ব্র্যাঞ্চএ গিয়ে তার ইচ্ছা প্রকাশ করে জানাবে যে, তজম্মুল হুসেনকে সে তার ওপর একটা সাফাই বিল লেখবার জন্য অনুরোধ করবে, সে জন্য ব্যাঙ্কের সহায়তা চাই। ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে কি সাহায্য করতে পারে, সেটাই হ'ল জ্ঞাতব্য বিষয়। সাধারণতঃ রপ্তানিকার যে সব বিল লেখে, সেগুলি হচ্ছে দলিল-যোগ বিল, অর্থাৎ বিলটা ভাঙ্গাবার সময় তার সঙ্গে জাহাজী চালান রসিদ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক দলিল-পত্র জুড়ে দিতে হয়। ব্যাঙ্ক বিলটা কিনে নিলেই বুঝতে হবে যে, রপ্তানিমাল খালাস করবার অধিকারও সে আয়ত্ত করে নিয়েছে। বিল কিনেই সে তা আমদানিকারের দেশে পাঠাবে তার শাখা-অফিসের কাছে। শাখা অফিস বিলের সর্ত্ত অনুসারে মূল্য আদায় করেই হোক, বা আমদানিকারের বিলের ওপর দায়-স্বীকার পেয়েই হোক,—মালের চালান রসিদটা ছেড়ে দেবে। এই রসিদ না পাওয়া পর্য্যন্ত মাল খালাস করবার উপায় নেই। বিলের সঙ্গে চালান রসিদটা নেবার অর্থ এই যে, টাকা আদায় বা আমদানিকারের দায়-স্বীকার না পাওয়া পর্য্যন্ত মালটা ব্যাঙ্ক নিজের তাঁবেই রাখতে পারে। বিল ভাঙ্গিয়ে নেবার পর রপ্তানিকার যদি দেউলে হয়ে যায়, আর আমদানিকার মাল খালাস করতে বা বিলের ওপর

দায়-স্বীকার করতে গররাজী হয়, তা হ'লে মালটা বেচেই ব্যাঙ্ক তার বিলের ক্রয়-মূল্য বা তার অনেকাংশ আদায় করে নিতে সক্ষম হবে। বিলের ওপর দায়স্বীকার না পাওয়া পর্য্যন্ত আমদানিকারকে পাকড়াও করবার উপায় নেই,—অথচ বিলটা আমদানিকারের কাছে পৌঁছাবার আগেও ত রপ্তানিকার অর্থাৎ বিল বিক্রেতা দেউলে হ'য়ে যেতে পারে। এমনি অবস্থায় যদি মালের ওপরও ব্যাঙ্কের কোন হাত না থাকে, তবে সে বিলগুলি কিনবে কোন ভরসায় ?

অথচ সব সময় এ নিয়ম মেনে চলতে গেলে ব্যবসায়ীদের পক্ষে একটু অসুবিধা হতে পারে। মাল পৌঁছাবাব দিনই হয় ত কোন খদ্দেরকে "ডেলিভারি" দেবাব চুক্তি কবা হয়েছে, বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, আমদানি জাহাজ বন্দরে ভিড়তেই মালটা খালাস কবে নেবার দরকাব হ'তে পারে। এ ক্ষেত্রে চালান রসিদ প্রভৃতি দলিল যদি ব্যাঙ্কের হাতে গিয়ে আটকে. পড়ে, তা হলে ব্যাঙ্কের কাছে গিয়ে বিলের ওপর দায়-স্বীকার করে রসিদটা আদায় করে নিতেও ২।৩ দিন সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই সময়ের অপব্যয়টা বাঁচাবার জন্যই সাফাই বিলের দরকার। সাফাই বিলে রপ্তানিকার মালের চালান রসিদটা সোজাসুজি আমদানিকারের কাছেই পাঠাবে। ব্যাঙ্কের কাছে যে বিলটা ভাঙানো হবে তাতে আনুষঙ্গিক কোন দলিল-পত্রই থাকবে না।

এখন কথা হ'ল যে, এ রকম বিল ব্যাঙ্ক ভাঙাতে দেবে কেন ? তা কি করে সম্ভব হবে, সেটাই হচ্ছে এ বিষয়ে প্রধান জানবার বিষয়। সেজন্য পূর্ব্ব দৃষ্টান্তটাই আবার অনুসরণ করা যাক। মিঃ রদারমেয়ার লণ্ডনে গিয়ে জাপানাল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে চালান রসিদ আদায় করবার কষ্টটা এড়াবার জন্য চায় যে, তজ্জন্য

সোজা তার কাছেই ডাণ্ডিতে চালান রসিদটা পাঠাক। এটা সম্ভব হতে পারে তা হ'লেই, যদি কোন রকমে সে ব্যাঙ্ককে রাজী করাতে পারে তজম্মুলের সাফাই বিলটা কিনে নিতে। এজন্ম মিঃ রদারমেয়ার স্তাশানাল ব্যাঙ্ক (বা অন্য কোন ব্যাঙ্ক যার ক'লকাতায় শাখা অফিস আছে) এর মত যাচাই করে দেখবে। ব্যাঙ্ক সম্মত হলে রদারমেয়ারকে একটা 'ফরম্' দেবে সই করবার জন্ম। মিঃ রদারমেয়ার তাতে এই সূত্রে একটা পাঠ লিখবে যে...(এত) তারিখ থেকে ··(এত) তারিখ পর্য্যন্ত ক'লকাতার তজম্মুল হসেন তাকে আদেশ করে...(এত) টাকা মূল্যের বিল লিখলে সে তার ওপর দায়-স্বীকার করতে বাধ্য থাকবে, এবং মেয়াদ ফুরোলেই বিলমাফিক টাকা ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় বুঝিয়ে দেবে। এর পর তজম্মুল হসেনএর পক্ষে সাফাই বিল ভাঙ্গাতে কোন বাধা থাকবে না। ব্যাঙ্কের ক'লকাতা অফিসে সেটা বিক্রী করা চলবে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যাঙ্কের সাফাই বিল কেনবার সঙ্গে তজম্মুলের বাজার সম্ভ্রমের কোন সম্পর্ক নেই। বিলের ওপর যে ব্যাঙ্ক টাকা লগ্নী করছে, সে শুধু মিঃ রদারমেয়ারের দায়-স্বীকার মূলক চুক্তির জোরেই। তবে একটা কথা,—আমদানিকার এরকম আগাম বন্দোবস্ত না করলে যে ব্যাঙ্কের পক্ষে সাফাই বিল কেনা অসম্ভব, তা নয়। ব্যাঙ্ক এমনিও বিল কিনতে পারে, তবে বুঝতে হবে যে, সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কেবল রপ্তানিকারকেই ভরসা করে বিলের দাম দিচ্ছে।

ডকুমেণ্টারি ক্রেডিট্

দলিল-যোগ বিলের দায়

সাফাই বিলের পর দলিল-যোগ বিলের ব্যাপার বুঝতে আর কোনও অসুবিধে হবে না। ওপরের দৃষ্টান্তে মিঃ রদারমেয়ার যদি সাফাই বিল না চেয়ে ব্যাঙ্কের কাছে শুধু তত্ত্বমূলের বিলটা ভাঙ্গাবার জন্যই একটা অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হ'ত, তা' হলে আমরা একটা দলিল-যোগ বিলের দৃষ্টান্ত দেখতে পেতাম। ব্যাঙ্ক তা' হলে তত্ত্বমূলের বিলের সঙ্গে চালান-রসিদ প্রভৃতি সমস্ত দলিলই দাবী করে বসত; কেন, তা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। এ সম্বন্ধে প্রথমেই একটা প্রশ্ন মনে আসতে পারে যে, দলিলগুলি যদি বিলেব সঙ্গেই রইল, তবে আর মিঃ রদারমেয়ার ব্যাঙ্ককে খোসামোদ করতে যায় কেন। বিল ত ব্যাঙ্ক নিজের গরজেই ভাঙ্গাবে। ব্যাপার কিন্তু তত সহজ নয়। বিলের তাৎপর্য্য থেকেই এর কারণ বোঝা যাবে। আদেষ্টা-পক্ষ আদিষ্টের কাছ থেকে প্রাপ্য ঋণের বা তার ঋণ-স্বীকারের ওপর নির্ভর করে বিলটা লেখে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ আদিষ্ট-পক্ষ বিলের ওপর দায়-স্বীকার না করা পর্য্যন্ত কোন বিলক্রেতাই তাকে আইনের বাঁধে পাকড়াও করতে পারে না। বিল বিক্রয় আসলে একটা প্রাপ্য ঋণের স্বত্ব ত্যাগ করা ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন চুক্তি আছে। বিলবিক্রেতা বিলটা বেচবার সময় ক্রেতার কাছে দাম পাচ্ছে বটে, কিন্তু তাতেই যে লেনদেনটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হ'য়ে গেল, তা নয়। বিল বিক্রয়ের মধ্যেই বিক্রেতা অর্থাৎ আদেষ্টার এই

চুক্তি প্রচ্ছন্ন র'য়ে গেল যে, ক্রেতা বিল মাফিক টাকাটা আদিষ্ট-পক্ষের কাছ থেকে যথা সময়ে পাবেই। যদি কোন কারণে আদিষ্ট-পক্ষ বিলের ওপর দায়-স্বীকার করতে অসম্মত হয়, তবে ক্রেতা আদেষ্টাকেই পাকড়াও করবে, তার চুক্তি রক্ষা করা হয় নি বলে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, বিলের ওপর দায়-স্বীকার না পাওয়া পর্য্যন্ত ক্রেতা বিলের মূল্য আদায় করবার জন্য নির্ভর করে আদেষ্টার ওপরই। আদিষ্ট-পক্ষ দায় স্বীকার করলেই ক্রেতা নিশ্চিন্ত হতে পারে, কারণ সে ক্ষেত্রে টাকাটার জন্য মুখ্যতঃ আদিষ্ট এবং গৌণভাবে আদেষ্টা উভয় পক্ষই দায়ী থাকে। বিলের ক্রেতা মাত্রই সে জন্য আদিষ্ট-পক্ষের দায়-স্বীকার পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। আগে থেকে এ বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত না করলে এর জন্য বেশ একটু সময় লাগতে পারে,—আমদানিকার এবং রপ্তানিকারের দেশের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান থাকলে এই দায়-স্বীকারটুকু আদায় করবার জন্যই ৩।৪ সপ্তাহ বিলম্ব হ'তে পারে। সে পর্য্যন্ত বিলক্রেতা আদেষ্টার মুখ চেয়েই বসে থাকবে। যদি তার মধ্যে আদেষ্টা দেউলে হয়ে যায়,—তা'হলে চালানী মালটাই হবে বিল-ক্রেতার সম্বল। শেষে নেহাতই যদি আদিষ্ট-পক্ষ অর্থাৎ আমদানিকার বিলটার ওপর দায়-স্বীকার করতে গররাজী হয় তবে সে মালগুলি বেচে দিতে পারে বটে, কিন্তু তা বেচলেই যে বিলের দামটা উঠে আসবে, তার কি ভরসা আছে? লোকসানও ত হ'তে পারে, আর দামটা কোন গতিকে আদায় হলেই বা কি? বিল কেনে ব্যাঙ্ক;—টাকা পয়সা লেনদেন করাই হ'ল তার পেশা,—মাল কেনাবেচার ঝঞ্ঝাট এবং বিপত্তি সে শুধু শুধু ঘাড়ে তুলে নিতে চাইবে কেন? কাজেই বিলের চালান-রসিদ এবং দলিল জুড়ে দিলেই যে সে খুসী হয়ে তা কিনে নেবে, তা নয়। বিলের

ওপর আদিষ্ট-পক্ষের দায়-স্বীকার সম্বন্ধেও সে গোড়া থেকেই নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। দলিল-যোগ বিলএ এর জন্ম যা করতে হবে, তা নূতন কিছু নয়। পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে মিঃ রদারমেয়ার যেমন করে তার সাফাই বিল দেখাবার বন্দোবস্ত করেছে, এখানেও ঠিক তেমনি আয়োজন করতে হবে। তফাৎ শুধু এই যে, দলিল-যোগ বিলের বেলায় রসিদ এবং দলিল সোজা আমদানিকার অর্থাৎ বিলের আদিষ্ট-পক্ষের কাছে পাঠানো হবে না; বিলক্রেতা ব্যাঙ্কের তাঁবেই সেগুলি দায়-স্বীকার না পাওয়া পর্য্যন্ত বিলের সঙ্গে গাঁথা থাকবে।

'কনফার্মড্ ব্যাঙ্কার্স ক্রেডিট্' বা কোন ব্যাঙ্কের অঙ্গীকৃত দায়-স্বীকারের ওপর ভর করে যে বিল লেখা হয়, তার সঙ্গে সাধারণ দলিল-যোগ বিলের একটু তফাৎ আছে। পূর্ব্ববর্ণিত বিলের ওপর আমদানিকারের ব্যাঙ্ক নিজেই বিলের ওপর দায়-স্বীকার করবার জন্ম চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু দলিল-যোগ বিলের বেলায় ব্যাঙ্কের এরকম কোন দায়ীত্ব নেই। দায়-স্বীকারের দায়ীত্বটা ঘাড়ে নেয় আমদানিকার,— ব্যাঙ্ক শুধু তারই ওপর ভর করে রপ্তানিকারের বিলটা কিনতে সম্মতি প্রকাশ করে। ইচ্ছা করলে ব্যাঙ্ক আমদানিকার এবং রপ্তানিকার উভয় পক্ষকে নোটিশ দিয়ে রপ্তানিকারের বিল কিনতে অসম্মতিও জানাতে পারে।

দলিল-যোগ বিলের আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে একটু খুঁটিনাটি জানা দরকার। বিলের সঙ্গে কতকগুলি দলিল পেশ করা অবশ্য প্রয়োজন। প্রথম, জাহাজী চালান-রসিদ, দ্বিতীয়, জাহাজী-বীমার পলিসি, তৃতীয়, চালান-মালের দামের পাকা ফিরিস্তি সব্বই থাকা চাই। ভারতবর্ষের রপ্তানি-বাণিজ্য সম্পর্কে এ সম্বন্ধে আরও দু'একটা কথা জানা দরকার। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কোন দেশে ভারতে-

প্রস্তুত মাল রপ্তানি করতে হ'লেই বিলের সঙ্গে মালের উৎপাদনক্ষেত্র পরিচায়ক সার্টিফিকেট পেশ করতে হয়। এই সার্টিফিকেটটা সংগ্রহ করতে হয় কোন 'চেম্বার অব্ কমার্স' বা বণিক-সঙ্ঘের কাছ থেকে। তা ছাড়া য়ুরোপের কন্‌টিনেন্ট্যাল কতকগুলি দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশে মাল পাঠাতে হ'লেই দামের ফিরিস্তিটা সে দেশের যে 'কন্‌সাল' বা বাণিজ্য পরিদর্শক গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এদেশে অবস্থান করছেন তাঁর দেওয়া ফর্ম্মে লিখে তাঁরই দস্তখত সহ পাঠানো দস্তুর। সবগুলি দলিলই দুই বা তিন প্রস্থে দেওয়া দরকার। এগুলি সব যথাযথ আছে কিনা তা' পরখ করেই তবে ব্যাঙ্ক বিল কেনবার বন্দোবস্ত করে। কেনবার আগে মালের ওপর যে জাহাজী বীমা করা হ'য়ে থাকে তা' ব্যাঙ্কের নামে লিখে দিতে হয়, কারণ নেহাতই যদি আমদানিকার বিলের ওপর দায়-স্বীকার না করতে পারে, আর রপ্তানিকার দেউলে হয়ে যায়, তবে জাহাজ ডুবে গেলেও ব্যাঙ্ক অন্ততঃ বীমা কোম্পানীর কাছ থেকে মালের দামটা আদায় করে নিতে পারবে। দলিলগুলির মধ্যে চালান-রসিদটাই হচ্ছে সর্ব্বপ্রধান। এটাই চালান-মালের স্বত্ব সূচনা করে থাকে।

ডি, এ, (ডকুমেন্টস্ অন্ অ্যাক্‌সেপ্‌টান্স)

দায়-স্বীকারে দলিল ছাড়

দলিল-যোগ বিল কেনবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঙ্ক বিলের আনুষঙ্গিক দলিল, চালান-রসিদ ইত্যাদির স্বত্ব লাভ করে, একথা অনেকবার বলা হয়েছে। বিলটা কেনবার পরেই ব্যাঙ্ক সেটা আমদানিকারের

দেশে তার শাখা অফিসের কাছে পাঠাবে, বিলের মূল্যটা আদায় করবার জন্য। সেখানে শাখা অফিস না থাকলে এ রকম কাজ যে চলতেই পারে না, তা নয়। অপর কোন স্থানীয় ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে কথিত ব্যাঙ্কের এজেন্ট হিসেবে কাজটা চালিয়ে দিতে পারে, অবশ্য তার প্রাপ্য যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা নিয়ে। শুধু টাকাটা আদায় করে পাঠিয়ে দেওয়া,—এ খুব শক্ত ব্যাপার কিছু নয়। এখন কথা হচ্ছে এই যে, আমদানিকারের দেশের শাখা অফিস (বা এজেন্ট) কি বিলের মূল্যটা আদায় করে তবে চালান-রসিদ ছাড়বে, না আমদানিকারের দায়-স্বীকার পেয়েই তাকে রসিদটা দিয়ে দেবে ? এর মীমাংসা নির্ভর করবে বিলের মোসাবিদার ওপর,—আর বিলেরও যে কি মোসাবিদা হবে, তা' নির্ভর করবে গোড়ায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমদানিকারের যা চুক্তি হয়েছে, তার ওপর। গোড়ায় ব্যাঙ্ক যদি আমদানিকারের দায়-স্বীকারেই রপ্তানিকারের বিল ভাঙ্গাতে সম্মতি প্রকাশ করে থাকে, আর তারই ওপর ভর করেই বিলটা লেখা হ'য়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই দায়-স্বীকার পেয়েই রসিদ ছেড়ে দেবে। সাধারণতঃ দলিল-যোগ দর্শনী বিলও দায়-স্বীকারেই রসিদ ছেড়ে দেওয়া হয়।

ডি, পি, (ডকুমেণ্টস্ অন্ পেমেণ্ট্)

আদায় সাপেক্ষ দলিল ছাড়

সাধারণতঃ হলেও সব সময়েই যে আমদানিকারের দায়-স্বীকারে চালান-রসিদ ছেড়ে দেওয়া হয়, তা নয়। পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে আমরা

দেখেছি যে, আমদানিকার নিজেই ব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তি করছে তার দায়-স্বীকারে দলিল ছেড়ে দেবার জন্য। আমদানিকারের ওপর যদি ব্যাঙ্কের এ রকম আস্থা থাকে তবে কোনই মুস্কিল হ'বার কথা নয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এ রকম আস্থা নাও ত থাকতে পারে! কোন স্থানীয় ব্যাঙ্ক যদি আমদানিকারের হয়ে চুক্তি-মাফিক বিলের ওপর দায়-স্বীকার করে, তা হ'লে অবশ্য কোন কথা নেই। বিল-ক্রেতা ব্যাঙ্কের সে ক্ষেত্রে কোন রকম সন্দেহ করবার কারণই থাকে না। 'কনফার্মড ব্যাঙ্কারস ক্রেডিট' আলোচনা করতে গিয়ে এর তাৎপর্য্য বিস্তারিত বলা হয়েছে। কিন্তু এ রকম, একটা ব্যাঙ্ক যেখানে দায়-স্বীকার করবার দায়ীত্ব ঘাড়ে না নিচ্ছে সেখানে বিল ক্রেতা ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করলেই সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে। এমনও হতে পারে যে, রপ্তানিকার নিজেই হয় ত আমদানি-কারের ওপর খুব আস্থা স্থাপন করতে পাচ্ছে না, পাছে আমদানিকার মাল খালাস করে তা বেচেই লালবাতি জ্বালিয়ে দেয়;—তা'হলে বিলের দায় তারই ঘাড়ে এসে পড়বে, এমনি ভয় হয় ত তার মনে মনে আছে। এমনি যেখানে ব্যাপার, সেখানে রপ্তানিকার নিজেই হয়ত চাইবে না যে, আমদানিকারের দায়-স্বীকার পেয়েই ব্যাঙ্ক চালান-রসিদ ছেড়ে দেয়। বিল-ক্রেতা ব্যাঙ্কেরও এ বিষয়ে রপ্তানি-কারের ওপর একটা ইঙ্গিত থাকা আশ্চর্য্য ব্যাপার কিছু নয়। অনাদায়ে বিলের মূল্যটা রপ্তানিকারের কাছ থেকে দাবী করবার স্বত্ব থাকলেও, কে চায় অনর্থক ঝঞ্ঝাট পোয়াতে? তাও সোজা ব্যাপার হলে হ'তে পারত,—কিন্তু রপ্তানিকারের কাছ থেকে টাকাটা দাবী করতে গেলেই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, ব্যাঙ্কের কোন রকম ত্রুটিই আমদানিকারের কাছ থেকে টাকা অনাদায়ের কারণ

নয়। তার চাইতে আগে থেকে আটঘাট বেঁধে আমদানিকারের কাছ থেকেই যাতে অতি সহজে নির্ঝঞ্ঝাটে বিলের দামটা আদায় করা সম্ভব হতে পারে, সে রকম কোন ব্যবস্থা করাই সে সুবুদ্ধির কাজ বলে মনে করতে পারে। এই মনোভাব থেকেই 'আদায় সাপেক্ষ দলিল ছাড়' বিলের সৃষ্টি হ'য়েছে। এই ধরণের বিল যেখানে ব্যবহার হয়, সেখানে বিলক্রেতা ব্যাঙ্ক আগে বিল-মাফিক টাকাটা আমদানিকারের কাছ থেকে আদায় করে, তবে চালান-রসিদ ছাড়ে, নইলে নয়।

বিল্ ফর্ কলেক্শন্

আদায়-চুক্তি বিল

যেখানে আমদানিকার বা রপ্তানিকারের ওপর আস্থা নেই বলেই হো'ক,—বা অন্য কোন কারণেই হো'ক,—ব্যাঙ্ক কোন বিল কিনতে চায় না, সেখানে তাকে দিয়ে অন্ততঃ এইটুকু কাজ করিয়া নেওয়া সম্ভব হতে পারে যে, সে তার শাখা অফিস বা 'এজেন্টএর' মারফৎ বিল-মাফিক টাকাটা বিদেশী আদিষ্ট-পক্ষ অর্থাৎ আমদানিকারের কাছ থেকে সংগ্রহ করে আনিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে দেবে। বস্তুতঃ ব্যাঙ্ক মাত্রই এরকম কাজ করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। এতে তাদের দায়ীত্বও কিছু নেই, লোকসান হবার ভয়ও কিছু নেই। তবে এ কাজের জন্য তারা নিজেদের প্রাপ্য কমিশনটা আদায় করতে ছাড়ে না।

ব্যাঙ্ক রেফারেন্স

ব্যাঙ্কের অভিমত পত্র

কোন ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে প্রথম মাল আমদানি করতে চাইলেই সেখানকার রপ্তানিকার তার কাছে 'ব্যাঙ্ক রেফারেন্স' বা ব্যাঙ্কের অভিমত দাবী করে বসে। এ রকম প্রথার স্বপক্ষে বেশ যুক্তি আছে। রপ্তানিকার যা করে যা তা লোকের সঙ্গে কারবার চালাতে গেলে শেষে বিড়ম্বিত হ'তে পারে। এজন্য আগে থেকেই তার জানা দরকার যে, তার নূতন খদ্দেরটী খাঁটি লোক কিনা। সে খবর নেবার প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে 'ব্যাঙ্ক রেফারেন্স'। রপ্তানিকার আমদানিকারের দেশের কোন ব্যাঙ্ককে এ সম্বন্ধে খবর দেবার জন্য অনুরোধ করে লেখে। লৌকিকতার খাতিরে এ রকম অনুরোধ রক্ষা করা এখন ব্যাঙ্ক-মহলে একটা প্রথাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক সময়ে রপ্তানিকার চেয়ে পাঠালে আমদানিকার নিজেই হয়ত কোন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এরকম অভিমত পত্র সংগ্রহ করে পাঠায়। এ রকম অভিমত পত্র দেবার মধ্যে ব্যাঙ্কের কোন দায়ীত্ব নেই। প্রস্তাবিত আমদানিকার সম্বন্ধে তার যা বিশ্বাস তাই সে লিখে পাঠায়। ব্যাঙ্কের কোন দায়ীত্ব না থাকলেও তার অভিমত-পত্রের ওপর আমদানিকারের সুবিধা অসুবিধা যথেষ্ঠ নির্ভর করে। ব্যাঙ্কও সে কথা বেশ ভাল করেই জানে, এবং সে থেকে যেটুকু সুবিধা করে নেওয়া সম্ভব, তা নিতেও হয়ত সে ছাড়ে না। কেউ অভিমত পত্র চাইতে এলে ব্যাঙ্ক যদি তাকে তারই কাছে একটা

আমানত হিসেব খুলতে বলে, তা হলে আশ্চর্য্য হ'বার কোন কারণ নেই।

স্বর্ণ-বিনিময় মান

দেশের যে মুদ্রা দেনা-পাওনার ব্যাপারে আদান প্রদান করা আইন সঙ্গত বা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে, তাকে বলা হয় 'চলৎসিক্কা'। এই চলৎসিক্কা সব দেশেই যে একই ধাতুর তৈরী হবে—বা এক ধাতুর তৈরী হ'লেও সমান ওজনের মুদ্রা হবে, তা নয়। চলৎসিক্কা রৌপ্যমুদ্রা হতে পারে, স্বর্ণমুদ্রাও হতে পারে বা অপর কোন নিকৃষ্ট ধাতুর তৈরী মুদ্রাও হ'তে পারে। ইংলণ্ডের চলৎসিক্কা 'পাউণ্ড' একটা স্বর্ণমুদ্রা,—চীনের চলৎসিক্কা 'টেল' একটা রৌপ্যমুদ্রা, ভারতবর্ষের চলৎসিক্কা 'টাকা' আরও নিকৃষ্ট ধাতুর তৈরী—; এর মধ্যে রূপো এবং দস্তা দু'ই মেশানো আছে। শুধু এতেই দেশের আর্থিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিচয় মেলে না। আরও অনেক কথা জানবার আছে। চলৎসিক্কা যদি স্বর্ণমুদ্রা হয় আর তা যদি আন্তর্জাতিক দেনাপাওনা মেটাবার জন্য দেশে বা দেশ থেকে অবাধে আমদানি-রপ্তানি করা চলে, তা হ'লে দেশটার আর্থিক ব্যবস্থাকে 'স্বর্ণমান' আখ্যা দেওয়া হয়। ঠিক এমনি কোন দেশে যদি চলৎসিক্কা রৌপ্যমুদ্রা হয়, আর পূর্ব্বকথিত আনুসঙ্গিক অবস্থাগুলি বর্ত্তমান থাকে,—তা হ'লে তার আর্থিক ব্যবস্থাকে 'রৌপ্যমান' বলা হবে। 'মা' ধাতু অনট্ প্রত্যয়ান্ত করে 'মান' কথাটার সৃষ্টি হয়েছে,—আর 'মা' ধাতুর

অর্থ হ'ল পরিমাপ করা ; দেশের দ্রব্য-সম্পদের মূল্য পরিমাপ করে বলেই এই 'স্বর্ণমান' বা 'রৌপ্যমান' প্রভৃতি আর্থিক 'মান' সূচক কথার ব্যবহার হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল যে এই বিভিন্ন মানওয়ালা দেশগুলির মধ্যে অন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে কি করে? বিভিন্ন দেশের মধ্যে মাল আমদানি-রপ্তানিকেই ত আমরা বাণিজ্য বলি, কিন্তু তা' ত অমনি হয় না। রপ্তানিকার তার মালের জন্য দাম চাইবে নিজের দেশের চলিত মুদ্রায় ; কিন্তু আমদানিকারের দেশের মুদ্রার সঙ্গে তার হয় ত কোন সাম্যই নেই। এ ক্ষেত্রে আমদানিকারই বা তার কেনা মালের দাম দেবে কি করে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে সব রকম মানওয়ালা দেশেরই পরস্পর মুদ্রা-বিনিময় সম্পর্কটা যাচাই করে নেওয়া দরকার।

স্বর্ণমানে স্বর্ণমান

প্রথম, যে দু'টো দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলেছে,—তার দু'টোতেই 'চলৎসিক্কা' একই ধাতুর মুদ্রা হ'তে পারে। তার সব চেয়ে সহজ দৃষ্টান্ত হ'ল ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া। পরদেশী বিলের জন্মকথা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখানো হ'য়েছে যে, এ ক্ষেত্রেও বিনিময়-হার ওঠানাবা করতে পারে,—অবশ্য মুদ্রা প্রেরণ খরচার দ্বারা নির্দ্ধারিত সীমারেখার মধ্যে বিলের টান-যোগান অনুসারে। প্রেরণ খরচা যাই হোক, বা তার জন্য ওঠানাবা যাই করুক, এই দৃষ্টান্তে বিনিময়-হার সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ইংলণ্ডের চলৎসিক্কা 'পাউণ্ড' এবং অষ্ট্রেলিয়ার চলৎসিক্কা 'পাউণ্ড' একই মুদ্রা। কিন্তু ফ্রান্স, জার্ম্মানী বা ইতালি প্রভৃতি দেশের চলৎসিক্কা স্বর্ণমুদ্রা হ'লেও সেগুলি পাউণ্ডেরই সামিল নয়। সেখানে বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হবে কি করে? সেও খুব কঠিন ব্যাপার কিছু নয়। দু'টো দেশের 'চলৎসিক্কার' মধ্যে যে সোনা

আছে তা' ওজন করে, সেগুলির পরস্পর পরিমাণ সম্বন্ধের ওপর ভর করেই বিনির্ময়-হারটা নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। এই বিনিময়-হারটাকে বলা হয় 'সম-ধাতু বিনিময়-হার'। কথাটা বলে রাখা ভাল যে, এই সম-ধাতু বিনিময়-হারটা প্রাত্যহিক আন্তর্জাতিক বিনিময়ে প্রবল থাকে না। এখানেও বিনিময়-হার মুদ্রা প্রেরণ খরচা দ্বারা নির্দ্ধারিত সীমারেখার মধ্যে দৈনন্দিন বিলের টান-যোগান অনুসারে ওঠানাবা করে।

স্বর্ণমানে রৌপ্যমান

এক দেশে স্বর্ণমান এবং আর এক দেশে রৌপ্যমান থাকলেও পরস্পরের বিনিময় সম্বন্ধটা বুঝতে খুব মুস্কিল হয় না। স্বর্ণমান দেশের 'চলৎসিক্কা' রৌপ্যমান দেশের পক্ষে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমান সোনা মাত্র; আবার রৌপ্যমান দেশের চলৎসিক্কা স্বর্ণমান দেশের পক্ষে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রূপো ছাড়া আর কিছুই নয়। পরস্পরের কাছে অপরের চলৎসিক্কার ধাতু হিসেবে একটা মূল্য আছে, তাই দিয়েই বিনিময়-হার নির্দ্ধারিত হয়। ইংলণ্ডের পাউণ্ডের মধ্যে যে পরিমাণ সোনা আছে, সেই পরিমাণ সোনা চীনের বাজারে যত 'টেল' এ বিক্রী হবে, তাই দিয়েই 'পাউণ্ড' এবং 'টেল' এর বিনিময়-সম্বন্ধ নিরূপণ করতে হবে। এ বিনিময় হারটা বলবৎ হবে চীনদেশে। আবার টেলের মধ্যে যে পরিমাণ রূপো আছে তা ইংলণ্ডে কিনতে যত পাউণ্ড বা পাউণ্ডের ভগ্নাংশ দরকার হবে, তাই দিয়েই বিলেতে 'পাউণ্ড' এবং 'টেল' এর বিনিময়-সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হবে। বিলেতের এবং চীনের বাজারে এই যে দু'রকম বিনিময়-হার নির্দ্ধারিত হবে, তার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকবে না, কারণ সোনা রূপোর পরস্পর বিনিময়-হার

গোটা দুনিয়া জুড়েই এখন প্রায় এক হ'য়ে গেছে। একটু আধটু যা বৈষম্য চোখে পড়ে, তার কারণ হ'ল ধাতুবিশেষ স্থানান্তরিত করবার যা ব্যয়,—শুধু তাই। সোনারূপোর মত মূল্যবান ধাতুর পক্ষে সে ব্যয়টা খুব বেশী নয়।

ভারতবর্ষে বিনিময় মান

ভারতবর্ষে যে মানটা প্রচলিত আছে তা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। সেটা না স্বর্ণমান,—না রৌপ্যমান। এর নাম হ'ল 'স্বর্ণ-বিনিময় মান'। এই নামাকরণ থেকেই এর পরিচয় পাওয়া যাবে। দেশের কোন আভ্যন্তরীণ লেনদেনের জন্য হ'লে 'টাকা' দিয়েই তা মেটানো যেতে পারে, কারণ দেশের মধ্যে টাকাই হ'ল 'চলৎসিক্কা'। এ রকম দেনাপাওনা মেটাবার জন্য পাওনাদার স্বর্ণমুদ্রা বা সোনা চাইলে দেনদার তা' দিতে বাধ্য নয়। কিন্তু বিদেশ থেকে মাল চালান এনে দাম দিতে গেলেই টাকার বদলে সোনা পাওয়া যাবে। তার জন্য একটা বিনিময়-হার বেঁধেও দেওয়া হয়েছে;—আমদানি রপ্তানির জন্য এই স্থিরীকৃত বিনিময়-হার অনুসারে একটা টাকা ১ শিলিং ৬ পেন্সের সমান। শিলিং এবং পেন্স স্বর্ণমুদ্রা না হ'লেও ১ শিলিং ৬ পেন্স একটা পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রার ভগ্নাংশ সূচনা করে বলে তাকে আমরা সেই ভগ্নাংশ পরিমাণ সোনার সামিল বলেই গণ্য করতে পারি। এই হিসেবে বিদেশী বিনিময়ের জন্য ভারতীয় টাকার একটা নির্দ্দিষ্ট স্বর্ণ-মূল্য আছে, বুঝতে হবে।

এই বিচিত্র ব্যবস্থার ঠিক আবিষ্কর্ত্তা না হলেও এদেশে এর সৃষ্টিকর্ত্তা হচ্ছে ভারত গভর্ণমেণ্ট। গভর্ণমেণ্টই এই দায়ীত্ব স্বীকার করে নিয়েছে যে, সে বিদেশী বিনিময়ের জন্য প্রতি টাকায় ১ শিলিং ৬ পেন্স

দিতে বাধ্য থাকবে। কেন তার এমনি মতি হ'ল সে আলোচনা করতে গেলে এক মহাভারতের সৃষ্টি হবে। শুধু এই সম্পর্কে এই ব্যবস্থার দায়ীত্বের জের, রহস্য ও ক্রিয়া-পদ্ধতিটা বুঝতে পারলেই যথেষ্ট হ'বে। তার জন্য কতকগুলি কাল্পনিক ব্যাপারের অবতারণা করা যাক্ :—

এমনি একটা সময়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে রাজত্ব স্থাপন করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ এবং বিলেতের মধ্যে কোন বাণিজ্য চলছে না। ভারত গভর্ণমেণ্টের এখন যে চেহারা তাই নিয়েই ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে তখনও অর্থের প্রচলন হয় নি। তাল সোনা থেকে ওজন হিসেবে টুকরো কেটে তাই দিয়ে জিনিষ কেনাকাটা চলে। গভর্ণমেণ্ট অর্থ প্রচলনের জন্য আয়োজন করছে। এমনি সময় লণ্ডনের মেসাস জ্যাক্ জনসন কলকাতা থেকে একশ' মণ পাট আমদানি করলে। বিক্রেতা কলকাতার বিখ্যাত মহাজন হাজারীমল কুঠিয়াল। জ্যাক জনসন পাটের দাম বাবদ যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনা পাঠাবে বিলাতী মুদ্রার অনুপাতে তা ৫০ পাউণ্ডের সমান দাঁড়ায়। এই পরিমাণ সোণা যখন জ্যাক্ জনসন হাজারীমলের নামে জাহাজে চালান দেবার বন্দোবস্ত করছে, এমনি সময় 'সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ ভারত সচিব এসে বল্লেন, "সোনাটা পাঠিও না বাপু, ও একবার 'মেডিটারেনিয়ন সি' পেরিয়ে 'ইণ্ডিয়া'র মাটি ছুঁলেই গোল্লায় যাবে, আর ওর পাত্তাও পাওয়া যাবে না। সেখানে গিয়ে হয় তা হাজারীমলের 'জেনানা'র মাদুলি বা গাঁটছড়া তৈরী করতে যাবে, নয় ত পরকালের পুঁজি রাখবার জন্য মাটির নীচে সেঁদোবে।" জ্যাক্ জনসনের জবাব হ'বে, "তা' হলে দামটা কি

কি করে?" ভারতসচিব তখন আশ্বাস দিয়ে বলবেন, "কুছ্ পরোয়া নাই, তার ব্যবস্থা আমিই করে দিচ্ছি"। বলেই তিনি জ্যাকের কাছ থেকে পঞ্চাশটা পাউণ্ড চেয়ে নিলেন, আর তাকে একটা চিঠা দিয়ে দিলেন ভারতসরকারের কর্ম্মচারী 'কণ্ট্রোলার অব করেন্সী'র ওপর। তাতে তাঁর এই হুকুম থাকবে যেন প্রাপ্তিমাত্র কণ্ট্রোলার হাজারীমলকে সাতশ' টাকা দিয়ে দেয়। টাকা সম্বন্ধে ভারতসরকারের কাছে হুকুম এল যে সেগুলো হবে এক একটা ৬৫ গ্রেণ রূপো ও ১৫ গ্রেণ দস্তা মেশানো রাজার মাথার ছাপওয়ালা গোল গোল মুদ্রা;—তাই হবে ভারতবর্ষের 'চলৎ সিক্কা',—দেশের লেনদেন তাই দিয়েই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হ'তে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট এও ঘোষণা করে দিলে যে, বিদেশী বিনিময়ের জন্য টাকার বিনিময় মূল্য হবে ১ শিলিং ৬ পেন্স। জ্যাক্‌জনসন খুসী হ'য়ে সেই চিঠাটা নিয়ে হাজারীমলের কাছে পাঠিয়ে দিলে। এর পর হাজারীমলকে টাকা দিতে হবে, কিন্তু তা তৈরী করতে রূপো দস্তা চাই ত,—সে পাওয়া যাবে কোথায়? তার ব্যবস্থাও ভারত-সচিবই করে দেবেন। তিনি দেখলেন যে, নির্দ্ধারিত ওজনের সাতশ' টাকা তৈরী করতে যে পরিমাণ রূপো এবং দস্তা লাগে তা লণ্ডনের বাজারে দশ পাউণ্ডেই কেনা চলে। তিনি তাই কিনে পাঠিয়ে দিলেন কণ্ট্রোলারের কাছে,—আর যে চল্লিশ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত থেকে গেল, তা ভারতগভর্ণমেণ্টের নামেই একটা হিসেব খুলে ব্যাঙ্কে জমা রেখে দিলেন। কনট্রোলার যে রূপো পেলেন, তাই দিয়ে টাকা তৈরী করে হাজারীমলের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হ'ল। 'টাকা'কে যখন চলৎসিক্কা বলে ঘোষণা করা হ'য়েছে, তখন হাজারী-মলের তা' না নিয়ে আর উপায় কি?

এই গেল ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার প্রথম মোদ্দা কথা। কিন্তু এতেই শেষ হয় নি। এর পরই পাণ্টা ব্যাপার ঘটবে। এবার হাজারীমলই লণ্ডন থেকে পঞ্চাশ পাউণ্ডের ধুতি চালান আনবার আয়োজন করেছে। চালানও এল, কিন্তু সে দাম দেবে কি করে? পাট রপ্তানি করে সে পেয়েছে সাতশ' টাকা।—তা' দিয়ে দাম দেওয়া সম্ভব হবে কি করে? লণ্ডনে রপ্তানিকার ত আর রূপো নেবে না। সে চায় পাউণ্ড বা সোনা। এমনি যখন অবস্থা তখন গভর্ণমেণ্টকে সে বলতে চাইবে, "এ ত আচ্ছা ঠকএর ব্যাপার দেখছি,—জ্যাক যখন আমাকে পঞ্চাশটা পাউণ্ড পাঠাতে চাইলে তখন তোমরা তা আটকে রেখে আমাকে দিলে সাতশ টাকা, এখন আমি ধুতির দাম পঞ্চাশ পাউণ্ড দি কোত্থেকে? গভর্ণমেণ্টের জবাব হবে, "সে কি কথা, তোমাকে ত আমরা ঠকাতে চাই নি বাপু,—তোমাকে যে টাকা দিয়েছি, তাকে ত আমরা চলংসিক্কা করেই ছেড়েছি. দেশের মধ্যে যে কোন লেনদেন তুমি তা দিয়ে চালাতে পারতে। লেনদনএর জন্যই ত টাকা,—সে তুমি সোনা পেলেই বা কি হো'ত;—এ ত গিলে খাবার জিনিষ নয়? তা এখন তুমি আমদানি মালের জন্য পঞ্চাশটা পাউণ্ড চাইছ তোমার পাওনাদারকে দেবার জন্য,—ভাল কথা, আমরা ত বলেইছি, যে পরদেশী বিনিময়ের জন্য আমরা টাকা পিছু ১ শিলিং ৬ পেন্স দিতে বাধ্য থাকব। এই হারেই তোমাকে গোড়ায় পঞ্চাশ পাউণ্ডের বিনিময়ে সাতশ' টাকা দিয়েছিলাম. এখন সে টাকাটা নিয়ে এস, আমরা তোমার পাওনাদারের টাকা মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।" হাজারী মল টাকাটা বুঝিয়ে দিতে ভারতগভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট হিসেবে কন্‌ট্রোলার এবার লণ্ডনে ভারতসচিবের ওপর একটা পাণ্টা চিঠা দেবেন,—তাতে

লেখা থাকবে-যে, প্রাপ্তিমাত্র হাজারীমলের পাওনাদারকে যেন পঞ্চাশটা পাউণ্ড বুঝিয়ে দেওয়া হয়। হাজারীমল চিঠাটা নিয়ে পাঠিয়ে দেবে তার পাওনাদারের কাছে।

এখন প্রশ্ন উঠবে, অর্থসচিব এই পঞ্চাশটা পাউণ্ড পাবেন কোথায়? কেন, তার জন্যও ত মুস্কিল হ'বার কথা নয়! চল্লিশ পাউণ্ড ত তিনি আগেই ব্যাঙ্কে জমা করে রেখেছেন,—আর চাই দশ পাউণ্ড। সে জন্য হাজারীমলের কাছে যে সাড়ে'শ' টাকা পাওয়া গিয়েছে, তা যদি কন্‌ট্রোলার লণ্ডনে পাঠিয়ে দেয় তা হ'লে সে টাকাগুলি গলিয়ে যে পরিমাণ রূপো আর দস্তা পাওয়া যাবে, তাই বেচেই ভারতসচিব বাকী দশ পাউণ্ড যোগাড় করে নিতে পারবেন। সেই রূপো এবং দস্তা কেনাও ত হয়েছিল দশ পাউণ্ডেই। হাজারীমলের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিক থেকে তা'হলে এ বন্দোবস্তের জন্য আপত্তি করবার কোনই কারণ রইল না। এমনি যে ব্যবস্থা, তাকেই বলে 'স্বর্ণ-বিনিময় মান',—এর তাৎপর্য্য এই যে, শুধু পরদেশী বিনিময়ের জন্যই দেশীয় নিকৃষ্ট ধাতুব চলৎসিক্কার বিনিময়ে সোণা পাওয়া যাবে, অন্যথা নয়।

এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ হয়ত প্রশ্ন করবে, "এত প্যাচ-গোছ কেন, জ্যাক্ জনসনের সোণাটা সোজা আসতে দিলেই ত ল্যাটা চুকে যেত"। গভর্ণমেণ্ট এর যা জবাব দেবে, তার কোনটায় হয় ত যুক্তি থাকবে না,—কোনটা হয় ত সত্য অসত্য প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার হ'বে, কোন কোন কথা হয় ত গোপনই থেকে যাবে, কিংবা দু' একটা কথায় একটু সায় পাওয়া গেলেও কার্য্যতঃ বিশেষ উদ্যোগ দেখা যাবে না। প্রথম জবাবই হবে, "হ্যাঁ, একটু প্যাঁচগোছ হচ্ছে তা' ঠিক, কিন্তু তা না সহ্য করলে এই ব্যবস্থায় যেটুকু সুবিধে সেটা পাওয়া

দেত কি করে? এমনি ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেই ত ভারতসচিব কিছু কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে পাচ্ছেন। তা' থেকে ত একটা মোটা সুদ আসছে—সেটাও ভারত গভর্ণমেণ্টেরই প্রাপ্য। গভর্ণমেণ্টের এই আয়ের পথটা বন্ধ করে দিলে—তাকে হয় ত দেশবাসীর ওপর ট্যাক্সের হার চড়িয়ে দিতে হবে; গভর্ণমেণ্টের খরচ চালানোর ব্যবস্থা চাই ত'! প্রশ্ন কর্ত্তার পক্ষে এটা ঠিক একটা যুক্তি হবে না। সে বলবে, "তাই যদি হয়, তবে জমা টাকাটা ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেও। সেখানে কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখলেও সুদ আদায় হতে পারবে, আর সেই টাকাটা লগ্নী করে ব্যাঙ্ক দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সহায়তা করে তাদের পুষ্ট করে তুলতে পারবে।" গভর্ণমেণ্টের পাল্টা জবাব হবে "দেখচ ত, জমা টাকাটা শেষ পর্য্যন্ত বিলেতেই খরচ করবার দরকার হচ্ছে। সেটা গোড়ায় একবার ভারতবর্ষে পাঠানো, আবার সেটা বিলেতে নিয়ে আসা, এমনি করে দু'নো জাহাজ-মাসুল, ইন্সিওর খরচা দিয়ে লাভ কি?" এই পাল্টাজবাবের বিরুদ্ধেও একটা যুক্তি আছে, সেটা প্রসঙ্গক্রমে জেনে রাখা ভাল। ওপরের দৃষ্টান্তে দেখানো হয়েছে যে, হাজারীমল তার ধুতির আমদানি-চালানের দাম দেবার জন্য কন্‌ট্রোলারের কাছ থেকে চিঠা নিচ্ছে বিলেতে ভারতসচিবের ওপর। ঠিক এমনি ব্যবস্থা করবার দরকার নাও হ'তে পারে। যদি এমন হয় যে, হাজারীমল যখন পঞ্চাশ পাউণ্ড পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে, তখন কলকাতারই আর একজন পাট রপ্তানিকার একটা পঞ্চাশ পাউণ্ডের রপ্তানি-বিল বিক্রী করতে চাচ্ছে লণ্ডনেরই কোন আমদানিকারের ওপর, তা হ'লে হাজারীমল ত সেই বিলটা কিনেই তার দেয় টাকা পাঠাতে পারে;—কারণ নির্দ্ধারিত হার অনুসারে সেটাও ত টাকা প্রতি ১ শিলিং ৬ পেন্সেই বিক্রী হবে। গভর্ণমেণ্ট

যখন ওই হারে চিঠা দিতে প্রস্তুত, তখন বিল-বিক্রেতার পক্ষে ত অন্য কোন হারে দাম আদায় করা সম্ভব হবে না। তাই যদি হয়, তবে ত সব আমদানিকার দেশের রপ্তানি-বিল কিনেই কাজ সারতে পারে। শুধু তাই নয়। রপ্তানি বিল অর্থাৎ রপ্তানি মালের দাম যদি আমদানিকারদের চাহিদা অর্থাৎ আমদানি-মালের দামের চাইতে বেশী হয়, তবে ত আমদানিকারদের মোটেই যেতে হবে না কনট্রোলারের কাছে, তাদের দাবী পেশ করতে। আর তা'হলে ভারত-সচিবের ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া টাকায় হাতও দেবার দরকার হ'বে না।— বরং তা থেকে বছরের পর বছর স্বদ আদায় হ'তে পারবে। বস্তুতঃ হয়ও তাই। ভারতবর্ষের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য খতিয়ে দেখলেই চোখে পড়বে যে, এদেশের রপ্তানি-মালের দাম ফি বছরেই আমদানি-মালের দামকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে।

সে যাই হোক, ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার প্যাঁচগোছের স্বপক্ষে গভর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ এই যে, এ দেশে সোনা এলেই নাকি সেটা হয় গহনায় রূপান্তরিত হ'বে, নয়ত মাটির নীচে সেঁদোবে। এ যুক্তি সত্য অসত্য প্রমাণের বাইরে। গোটা দুনিয়ার সব দেশেই গহনার ব্যবহার আছে।—ভারতবর্ষে সোনা এলেই তাকে এমনি করে আটক দেওয়া হচ্ছে, এ কথা আংশিক ভাবে সত্য মেনে নিলেও একথা বলা চলে না যে, সে দুনিয়াছাড়া একটা কাণ্ড করছে। এ রকম অবস্থায় অন্য প্রায় সব দেশেই যখন স্বর্ণ-মান বহাল রাখা সম্ভব হয়েছে, তখন ভারতবর্ষেই বা তা অসম্ভব হবে কেন? আর মাটির নীচে পুঁতে ফেলবার কথা তুল্লে ত এমনি জবাব দেওয়া চলে যে, স্বর্ণমান নেই বলেই লোক গভর্ণমেণ্টের ওপর আস্থা রাখতে পাচ্ছে না;—তারাও

একথা বলতে পারে যে, গভর্ণমেণ্ট যখন আভ্যন্তরীন লেনদেনের জন্য স্বর্ণমুদ্রা দাবী করবার ক্ষমতা দিচ্ছে না, তখন যেটুকু পাই, সেটুকুই সাম্‌লে রাখি।

তারপর গভর্ণমেণ্ট যে কথাটা গোপন রেখে যাচ্ছে, সেটা হ'ল এই :—গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই বলবে না যে, এই ব্যবস্থার সঙ্গে বৃটিশ-গভর্ণমেণ্ট বা ইংলণ্ডের স্বার্থের কোন যোগাযোগ আছে। ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে অবাধ সোনা-রপ্তানির সুযোগ থাকলে যে বিলেতের টাকার বাজারে টান পড়তে পারে এবং সে রকম হ'লে যে সেখানকার ব্যবসা শিল্পের ক্ষতি হ'তে পারে, এ কথাটা গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করবে না,—পাছে এই যুক্তি ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার অন্যতম কারণ বলে প্রতিপন্ন হয়, সেই আশঙ্কায়। শুধু ভারতবর্ষের স্বার্থের দিকে চেয়েই এই ব্যবস্থা করা হ'য়েছে, এই যুক্তিটাকেই গভর্ণমেণ্ট উঁচিয়ে রাখতে চায়।

যখন এঁটে ওঠা আর সম্ভব হয় না, তখন গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি কথায় সায় দেয় বটে, কিন্তু কিন্তু তার জন্য কোন ব্যবস্থা করবার উদ্যোগ দেখা যায় না। অনেক বারই তাকে বলা হ'য়েছে যে, এই আর্থিক ব্যবস্থার ভারটা ত কোন ব্যাঙ্কের হাতে ছেড়ে দিলেই চলতে পারে। ভারতসচিব ও কন্‌ট্রোলার যে ভাবে কাজটা চালাচ্ছেন, সেটা ত আসলে একটা ব্যাঙ্কেরই কাজ; গভর্ণমেণ্ট ত নিজের গাঁটের টাকা কিছু বের করছে না এর জন্য; এত প্রায় মাছের তেলে মাছ ভাজার মতই ব্যাপার। যুক্তিটার যাথার্থ্য গভর্ণমেণ্ট বুঝে নিয়েছে অনেক দিন,—কিন্তু একটা ব্যাঙ্ক সত্যি করে প্রতিষ্ঠা হ'ল না এত দিনেও।

যাক, ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে যে দায়ীত্ব এবং রহস্য রয়েছে তা' এতক্ষণে, বোধ হয় খানিকটা বোঝা গেছে। এর সমস্যা বা

দোষ গুণ নিয়ে আমাদের এখন বেশী আলোচনা না করলেও চলবে।* তাতে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপ বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। কিন্তু তা' হলেও বর্ত্তমান ব্যবস্থার প্রক্রিয়াগুলি বুঝে রাখা দরকার। এতক্ষণ ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার যে বর্ণনা দেওয়া হ'য়েছে,—তাতে তথ্যের চেয়ে তত্ত্বের দিকেই মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বেশী। ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার ক্রম-বিকাশ না দেখিয়ে একটা নিছক আখ্যান দিয়ে দিয়ে সুরু করা হ'য়েছে,—উদ্দেশ্য, এই ব্যবস্থার গোড়াকার কলকাঠিটার খোঁজ নেওয়া। এবার তথ্যের দিকে একটু মনোযোগ দেওয়া যাক। এইখানে দু'টো জিনিষের পুনরুক্তি আবশ্যক; প্রথম, একটা কথা যে ভারতবর্ষ্যের রপ্তানির মূল্য আমদানির চেয়ে বেশী; দ্বিতীয় কথা হ'ল এই যে, টাকার বিনিময় মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স গভর্ণমেণ্টই ধার্য্য করে দিয়েছে,—দরকার হ'লে সেই এ বিনিময়-হার পোষণ করবার ব্যবস্থা করবে। এই শেষের কথাটাতেই আখ্যানের হেঁয়ালী বাদ দিয়ে তথ্যের খোঁজ নিতে হবে। আখ্যানে বলা হয়েছে যে, হাজারীমল তার আমদানি-চালানের দাম দিতে কন্‌ট্রোলারের কাছ থেকে পাণ্টা চিঠা দাবী করবে ভারত-সচিবের ওপর। পরে একথাও বলা হয়েছে যে, কার্য্যতঃ তার কন্‌ট্রোলারের কাছে যাবার দরকার হ'বে না, কারণ রপ্তানি-বিলের এত প্রাচুর্য্য রয়েছে যে, সে বাজারেই বিল কিনে তার পাওনাদারের কাছে দাম পাঠাতে পারবে। তথ্যের দিক দিয়ে দু'টো কথাই কাল্পনিক, অথচ একেবারে মিথ্যে নয়। কেন, এবার সেটাই যাচাই করে দেখতে হ'বে। ভারতের আমদানি-মালের দাম রপ্তানি-বিলের সহায়তায় দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তার জন্য আমদানিকার রপ্তানি-

* ভিন্ন পুস্তকে ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।—গ্রন্থকার।

কারকে খুঁজে বেড়ায় না। উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করে ব্যাঙ্ক, সেটা কি করে সম্ভব হয় তা 'বিলের জন্মকথার' শেষাংশেই আলোচনা করা হ'য়েছে। আমদানিকার সোজাসুজি রপ্তানিকারের বিল কিনে না নিলেও ব্যাঙ্ক যে আমদানিকারের টাকা পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিতে পাচ্ছে রপ্তানি-বিলের কেরামতিতেই, এ কথাটা বেশ ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার।

এইখানে একটা প্রশ্ন উঠবে এই যে, বিদেশে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা যদি ব্যাঙ্কই করে দেয়, তবে আর গভর্ণমেণ্টের দায়ীত্ব রইল কোথায়? প্রশ্নটায় বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। গভর্ণমেণ্টের দায়ীত্ব হচ্ছে বিনিময়-হার পোষণ করা। তার অর্থ এই নয় যে, গভর্ণমেণ্টকে টাকা পিছু ১ শিলিং ৬ পেন্স, ঠিক এই হারই প্রবল রাখতে হবে। এর আগে একবার অষ্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের উপমা দিয়ে দেখানো হ'য়েছে যে, এই দুটো দেশে একই 'চলৎসিক্কা' প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও বাজারে দৈনন্দিন বিলের টান-যোগান অনুসারে নির্দ্ধারিত সীমারেখার মধ্যে বিনিময়-হার ওঠানাবা করে। এই সীমারেখা দুটা স্থির করে দিয়েছে স্বয়ং প্রকৃতি, যে বিলাতী পাউণ্ডের ১২৩'২৭৪ গ্রেণ সোণাকে অষ্ট্রেলিয়ান পাউণ্ডের ১২৩'২৭৪ গ্রেণ সোণার সমান করে রাখছে; কখনও খেয়ালের বশবর্ত্তী হয় উভয়ের মধ্যে বৈষম্য ঘটাচ্ছে না। একদিন যদি দেখা যেত যে, অষ্ট্রেলিয়ান পাউণ্ডগুলি হটাৎ সঙ্কুচিত হয়ে প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ সোণায় পরিণত হয়েছে, তা' হলে বিনিময়-হারের সমতা রক্ষা হ'ত না,—দৈনন্দিন বাজারচল্‌তি হারও যে সীমা অতিক্রম করে কোথায় গিয়ে দাঁড়াত, বলা যায় না। এখন কথা হ'ল এই যে, যে বিনিময়-হারের সমতা প্রকৃতি রক্ষা করছে ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে, সেই সমতাই ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে রক্ষা

করেছে ভারতগভর্ণমেণ্ট—একটা টাকাকে ১ শিলিং ৬ পেন্স সোণার সমান ঘোষণা করে। তুল্য ধাতুমুদ্রা থাকা সত্বেও ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে দৈনন্দিন বাজারচল্‌তি বিনিময়-হার যখন স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হ'য়েই বিলের টান-যোগান অনুসারে স্বভাব-নির্দ্ধারিত সীমারেখার মধ্যে ওঠানাবা করে, তাহ'লে টাকার বেলায়ও সে রকম কিছু হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বুঝতে হবে। বস্তুতঃ টাকার বেলায়ও দৈনন্দিন বাজারচল্‌তি হার বিলের টান-যোগান অনুসারে নির্দ্ধারিত সীমারেখার মধ্যে ওঠানাবা করে। ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে ১ শিলিং ৬ পেন্স পাঠাতে যে খরচা লাগে, সেটা ১ শিলিং ৬ পেন্সের সঙ্গে যোগ করে দিলে বিনিময়ের উর্দ্ধতম সীমা পাওয়া যাবে; আবার সেই খরচাটাই ১ শিলিং ৬ পেন্স থেকে বাদ দিয়ে দিলে যা পাওয়া যাবে সেটা হবে বিনিময়ের নিম্নতম সীমা। বিল অব্ এক্সচেঞ্জএর জন্মকথায় কথিত কাল্পনিক দৃষ্টান্তে লণ্ডন সহরেই ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার একশত মুদ্রা বিনিময়ের যে উর্দ্ধতম সীমা ১০১ পাউণ্ড ও নিম্নতম সীমা ৯৯ পাউণ্ড পাওয়া গিয়েছিল, তা এই পদ্ধতি অনুসারেই,—প্রেরণ খরচা এক পাউণ্ড একবার একশ' পাউণ্ডের সঙ্গে যোগ ও একবার বিয়োগ করে। টাকার বেলায়ও তাই হ'য়ে থাকে। তবে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্তের সঙ্গে যে তফাৎ, সেটা বেশ ভাল করে বুঝতে হবে। লণ্ডনের দৃষ্টান্তে আমরা দেখেছি যে, আমদানিকার মিঃ হফ্‌ম্যান্ ষ্ট্যান্‌লির বিলের জন্য কিছুতেই একশ'এক পাউণ্ডের বেশী দেবে না, কারণ তার বেশী দিতে হ'লে সে নিজেই একশ' পাউণ্ড ইন্সিওর করে পাঠাবে, কিন্তু ভারতীয় আমদানিকারের পক্ষে সে রকম পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হতে পারে কি? বিনিময়ের সীমা অতিক্রম করলেও ত তার পক্ষে টাকা চালান দিয়ে বিদেশী পাওনাদারের দাবী মেটাবার

পথ নেই। কিন্তু বিনিময়ের এই সীমাই যদি রক্ষিত না হয়, তবে আর বিনিময়-হার বেঁধে দেওয়ার তাৎপর্য্য কি রইল? এজন্যই চাই বিশেষ একটা ব্যবস্থা, যা কোন স্বর্ণমান দেশের পক্ষে প্রয়োজন হয় না। সেটা হচ্ছে এই যে, যে গভর্ণমেণ্ট এই স্বর্ণ-বিনিময় মান প্রতিষ্ঠা করবে, তাকেই বিনিময়ের সীমা রক্ষার জন্য দায়ী হ'তে হবে। ভারতগভর্ণমেণ্ট তাই করছে এবং তার পক্ষে প্রতি টাকার বিনিময় মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স নির্দ্ধারণ দেওয়ার তাৎপর্য্য আর কিছু নয়, শুধু এই উর্দ্ধতম ও নিম্নতম সীমা রক্ষা করে চলাই। ভারতবর্ষের রপ্তানি-বিলগুলি লেখা হয় সব বিদেশী স্বর্ণমুদ্রার অঙ্কে। তার যোগান যখন আমদানির চাইতে বেশী তখন সর্ব্বদাই একটা ঝোঁক থাকে সীমা অতিক্রম করে যাবার। যখনই এমনি অবস্থা দাঁড়ায়, তখনই গভর্ণমেণ্ট এসে যোগ দেয় আমদানিকারের সাথে বিদেশী মুদ্রা অর্থাৎ পাউণ্ড ষ্টারলিং কেনবার জন্য। ভারত-সচিবের আস্তানার খরচ ও ভারতের বিলাতী ঋণের সুদ ও জিনিষ কেনা কাটার জন্য গভর্ণমেণ্টকে ফি বছরই বিস্তর টাকা ইংলণ্ডে পাঠাবার দরকার হয়। রপ্তানি-বিলের মারফৎ এই টাকাটা বেশ পাঠানো চলতে পারে। যখন যখন বিলের টান-যোগানের মধ্যে বৈষম্য এসে পড়ে, ঠিক তখন তখনই এই টাকাটা দফে দফে পাঠানোর নিয়ম কায়েম করা হ'য়েছে। তাতে বিনিময়ের সমতা অর্থাৎ সীমাও রক্ষা হয় এবং সেই সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের বিলেতে টাকা চালান দেওয়াও সম্ভব হ'তে পারে। আর্থিক ব্যবস্থার ওপর গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রন এইখানে। বলা-বাহুল্য, গভর্ণমেণ্টের এই বিলমারফৎ টাকা পাঠাবার ব্যাপারটা চলে ব্যাঙ্কেরই সঙ্গে,—কারণ রপ্তানি-বিল সব কেন্দ্রীভূত হয় এই ব্যাঙ্কেরই হাতে।

আমদানিকারদের মত এই যে গভর্ণমেন্ট পাউণ্ড ষ্টারলিং কিনে বিনিময়-হারের সীমা রক্ষা করছে, এ ব্যাপারটা নিয়ে আর একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা না করলে ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার আখ্যান-ভাগের হেঁয়ালী আংশিক ভাবে অপ্রকাশিতই থেকে যাবে। কাজেই এ বিষয়ে 'অধিকন্তু ন দোষায়' পন্থা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আখ্যানে বলা হয়েছে যে, ভারত-সচিব জ্যাক্ জনসনের পঞ্চাশ পাউণ্ড নিয়ে তার চল্লিশ পাউণ্ড রাখবেন কোন ব্যাঙ্কে ভারত-গভর্ণমেণ্টের আমানত হিসেবে, আর দশ পাউণ্ড দিয়ে রূপো দস্তা কিনে পাঠাবেন। ব্যাপারটা এখানেই একটু তলিয়ে দেখা ভাল। এমনি করে ভারত-গভর্ণমেণ্টের পৃথক হিসেবে টাকা রাখা হবে তখুনি, যখন ভারত-সচিবের এই জমার ওপর ভর করেই এদেশে নতুন করে টাকা বা নোট বের করা হবে। এজন্য ভারত-সচিবের তাঁবে দুটো ফণ্ড আছে, একটার নাম 'স্বর্ণমান রক্ষী ফণ্ড', আর একটার নাম 'কাগজী মুদ্রা রক্ষী ফণ্ড'। নূতন টাকা বা নূতন নোট বের করবার ব্যবস্থা অনুসারে ভারত-সচিবের কাছে গচ্ছিত টাকা এই দুই পৃথক হিসেবে আমানত থাকে। কিন্তু কেবল নূতন টাকা বা নোট বের করবার জন্যই যে তাঁকে এ রকম পাউণ্ড জমা নিয়ে কনট্রোলারের ওপর চিঠা ছাড়তে হবে, তা নয়। তাঁর নিজেরও ত খরচপত্র চালাবার জন্য টাকা চাই,—তার পরিমাণও ত কম নয়। ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হিসেবে এই টাকাটা তাঁর পাওনা হচ্ছে ভারত-গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকেই। টাকাটা যদি ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের করেন্সি কনট্রোলার গভর্ণমেণ্টের খাজাঞ্চি হিসেবে এদেশের রাজস্বের আদায় থেকে পাঠিয়ে দেয়, তা হ'লে হয় ত ব্যাপারটাকে বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না। বস্তুতঃ কিন্তু তা কোনদিনই করা হয় নি। শুধু শুধু খরচ করে টাকাটা বিলেতে

পাঠিয়ে লাভ কি? তার চেয়ে যদি ভারত-সচিব ইংলণ্ডের আমদানি-কারদের কাছে তাঁর প্রয়োজন মত টাকার জন্ত কথিতরূপ চিঠা বিক্রয় করেন ভারত-সরকারের ওপর, তা হ'লে তাঁরও খরচের টাকাটা আদায় হ'তে পারে, এ দেশ থেকে টাকা পাঠাবারও দরকার হয় না। ভারত-সচিবের পাওনা টাকা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব থেকে বার করে তারই চিঠা অনুসারে বিলাতী আমদানিকারদের যারা স্থানীয় পাওনাদার তাদের মিটিয়ে দিলেই হ'ল। এ রকম ক্ষেত্রে চিঠা বিক্রয়ের টাকা কোন ফণ্ড গচ্ছিত না রেখে ভারত-সচিবের পৃথক আমানত হিসেবেই রাখা হ'বে, তাঁর প্রয়োজন মত খরচ করবার জন্ত। বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত-সচিবেরা তাই করেই ভারত গভর্ণমেণ্টের বিলাতী খরচাগুলি মিটিয়েছেন। তবে মাঝে মাঝে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত চিঠা ছাড়তেও কসুর করেন নি। যখনই এমন অতিরিক্ত চিঠা ছেড়েছেন, তখনই চিঠার অতিরিক্ত বিক্রয়-মূল্য হয় স্বর্ণমান-রক্ষী নয় ত কাগজীমুদ্রা-রক্ষী ফণ্ডে জমা হ'য়েছে, আর তারই ওপর ভর করে নূতন টাকা কিংবা নূতন নোট বার করা হ'য়েছে। লড়াইয়ের সময়ই তাঁরা বেশী করে এই কাণ্ডটা করেছেন, আর দেশী ব্যবসায়ী এবং একসচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি তুমুল প্রতিবাদ করেছে। ভারত-সচিব যে চিঠাগুলি ছাড়েন, বিলেতে সে গুলি রপ্তানি-বিল হিসেবেই গণ্য হয়। এর যদি একটা পরিমাণ নির্দ্দেশ করা না থাকে, তা হ'লে একস্চেঞ্জ ব্যাঙ্ক তাদের ব্যবসা চালাবে কি করে? তারা ত আমদানি রপ্তানি বিলের একটা আনুমানিক টান-যোগানের ওপর নির্ভর করেই বাজার চল্‌তি বিনিময়-হার নির্দ্দেশ করে দেয়। এমনি অবস্থায় ভারত-সচিব যদি অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চিঠা ছাড়তে আরম্ভ করেন, তা হ'লে

ত ব্যাঙ্কগুলির সমস্ত হিসেবই ভেস্তে যাবার আশঙ্কা থাকে। ভারত-গভর্ণমেন্ট অনেক চেঁচামেচির ফলে এই আপত্তিটার যাথার্থ্য উপলব্ধি করেছে। তাই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারত-সচিবের চিঠা বিক্রয়ের প্রথা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে আসছে। খরচের টাকা এখনও তাঁর আগের মতই দরকার হচ্ছে, তবে এখন তাঁকে সে টাকাটা পাঠানো হচ্ছে একটু অভিনব কায়দায়। সে কায়দার ধরণ এর আগেই বর্ণনা করা হ'য়েছে। ভারতবর্ষে করেন্সি কনট্রোলার এখন নিজেই দেশী বিল বা টাকার বাজারে ষ্টারলিং কিনে ভারত-সচিবকে পাঠাচ্ছে। সময়ে অসময়ে খরচ মেটাবার জন্য এখনও ভারত-সচিব চিঠা ছাড়েন বটে, কিন্তু তাঁর খরচ আদায় সম্বন্ধে সেটা ক্রমশঃই গৌন ব্যাপার হ'য়ে পড়ছে। বলা বাহুল্য যে, ভারত-সচিবের চিঠা সংক্রান্ত সব লেনদেনের ব্যাপার চলে শুধু একসচেঞ্জ ব্যাঙ্কেরই সাথে যাদের ভারতবর্ষে শাখা অফিস আছে; ব্যক্তিগত ভাবে সেখানকার কোন আমদানিকারের সঙ্গে নয়। সব সময়ই সাক্ষাৎভাবে আমদানিকারের লেনদেন চলবে ব্যাঙ্কের সঙ্গে। জ্যাক জনসনের সোজাসুজি ভারত-সচিবের সঙ্গে দহরম মহরমের দৃষ্টান্তটা সত্যি করে একটা অর্থপূর্ণ আখ্যানই বটে।

একসচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

বিদেশী বিনিময় সহায়ক ব্যাঙ্ক

বর্তমান জগতে কারবারের বৈচিত্র্য অনুসারে বিবিধ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পর্য্যায়-ভুক্ত হ'য়ে পড়েছে। একই ব্যাঙ্কের পক্ষে

এখন পাচমেশালি কারবার চালানো দস্তর নয়। কোন কোন ব্যাঙ্ক হয় ত শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই টাকা লগ্নী ক'রে তাদের পোষকতা করে যাচ্ছে; কেউ কেউ হয় ত কেবল শিল্প কারখানারই টাকা যোগায়; আবার কারো কারো হয় ত কৃষি, গো-মেষাদি পালনের জন্য টাকা ধার দেওয়াই রেওয়াজ। এই বিভিন্ন শ্রেণীর হাওলাতকারীর প্রয়োজন ঠিক একই রকমের নয়। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়, তা সাধারণতঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না; তিন, চার কি বড় জোর ছ'মাস পর্য্যন্ত তার মেয়াদ থাকে। ব্যবসা-সংক্রান্ত বিল কিনে বা হ্যাণ্ডনোটের ওপর এরা টাকা হাওলাত দেয়। শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক যে টাকা কর্জ্জ দেয়, তা সাধারণতঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'য়ে থাকে। এদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে হয় ত ফ্যাক্টরীওয়ালা তার কারখানা গড়ে তুলবে; সে কারখানার মাল তৈরী হ'লে, তাই বেচে হয় ত ব্যাঙ্কের টাকা দফা-চুক্তিতে পরিশোধ করা হবে।—কাজেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এরকম কর্জ্জের টাকা দীর্ঘকাল স্থায়ী হবেই। কৃষি-সহায়ক ব্যাঙ্কের দেওয়া হাওলাতি টাকা দীর্ঘকাল স্থায়ীও হ'তে পারে, অনতিদীর্ঘকাল স্থায়ীও হ'তে পারে। লাঙ্গল, গরু কি মাটির সার কেনবার জন্য এরা যে কর্জ্জ দেয়, তা হয় ত চট্ করেই শোধ দেওয়া সম্ভব হ'তে পারে; কিন্তু জমিজমা কেনা বা ঘরবাড়ী তৈরী করবার জন্য টাকা কর্জ্জ নিতে হ'লে, তা একটু দীর্ঘকাল স্থায়ী হবেই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই এ রকম বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া মধ্যবিত্ত লোকের সঞ্চয়ের টাকা রাখবার জন্য পোষ্ট্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, গোটা দেশের ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রনের জন্য কেন্দ্রীয়ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আরও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক আছে। এ কথা ঠিক যে, একটা

ব্যাঙ্কের পক্ষেই পাঁচমেশালি কারবার চালানো একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু ব্যবসার সুবিধের জন্যই এখন ব্যাঙ্কের কারবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমুখী হ'য়ে গেছে। এমনি করেই আজকাল বাণিজ্য পোষক ব্যাঙ্ক, শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক, কৃষি-ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছে।

বাণিজ্য-সহায়ক ব্যাঙ্কের মধ্যেও আজকাল অনেক দেশেই দু'টো আলাদা শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। তার একশ্রেণী কেবল দেশের আভ্যন্তরীন ব্যবসারই টাকা যোগায়; এদের পরিচয় হ'ল কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক। আর এক শ্রেণীর ব্যাঙ্কের কারবার হ'ল দেশের বহির্বাণিজ্য পোষণ করা। দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সহায়তা করাই হ'ল এদের কাজ। তার জন্য এরা রপ্তানিকারের কাছ থেকে পরদেশী বিল কেনে এবং প্রয়োজন হ'লে আমদানিকারের জন্য বিলের ওপর দায়-স্বীকার করে;—তা ছাড়া আদায়-চুক্তিতে বিল নেওয়া, ব্যাঙ্কের অভিমত-পত্র দেওয়া, অন্য দেশে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া,— এ সব ব্যাপার ত আছেই। বস্তুতঃ এরাও কমার্শ্যাল অর্থাৎ বাণিজ্য-পোষক ব্যাঙ্ক,—কিন্তু সাধারণ কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক থেকে একটু আলাদা করে দেখবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এদের একটা বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে 'এক্সচেঞ্জ' বা বিনিময়-সহায়ক ব্যাঙ্ক। ভিন্ন দেশের সঙ্গে অর্থ-বিনিময়ের সহায়তা করে দেয় বলেই এদের এ রকম নাম দেওয়া হ'য়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা জেনে রাখা ভাল। ব্যাঙ্ক-বিষয়ক সাহিত্যে 'এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক' এবং 'এক্সচেঞ্জ কারবার' দু'টো কথারই ব্যবহার আছে। দু'টোর তাৎপর্য্য ঠিক একই নয়। যে দেশে শুধু বিদেশী বিনিময়ের সহায়তার জন্যই একটা বিশেষ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে,

কেবল সেখানেই 'এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক' কথাটার একটা বিশেষ তাৎপর্য্য থাকতে পারে। কিন্তু এর আগেই বলা হ'য়েছে যে, একটা ব্যাঙ্কের পক্ষে পাঁচমেশালি কারবার চালানো অসম্ভব নয়। যদি কোন দেশের ব্যাঙ্কের পক্ষে আভ্যন্তরীন বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে বহির্বাণিজ্য পোষণ করাও দস্তুর হয়, তা হ'লে সে ব্যাঙ্ক একটা নিছক 'এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক' না হ'লেও তার সম্বন্ধে 'এক্সচেঞ্জ কারবার' কথাটার প্রয়োগ চলতে পারে। 'এক্সচেঞ্জ কারবার' কথাটার তাৎপর্য্য যে 'এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের' চেয়ে অধিকতর ব্যাপক তা এ থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় ভাগ

সমস্যা

ভারতে এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের বনিয়াদ

কিঞ্চিৎ পরিচয়

সংজ্ঞা প্রকরণ ছেড়ে এবার আসল প্রবন্ধে ঢোকবার চেষ্টা করা যাক। প্রবন্ধের বিষয় হ'ল 'ভারতে এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের বনিয়াদ'। ভারতের বহির্বাণিজ্যের এরাই হ'ল ভাগ্য-বিধাতা। তাকে রাখতে বল, মারতে বল, সেই মারণ-বাঁচন কাঠিটা কিন্তু এদের হাতেই র'য়ে গেছে। এ হেন শক্তিমান প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তা জানবার কোন পথ নেই। এদের সম্বন্ধে যা কিছু সামান্য খবর মিলবে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত এক ব্যাঙ্ক-বিবরণীতে।* সেটা ফি বছরই বেরোয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক বারই তাতে দু'বছর আগেকার বাসি খবর দেবে। সে যা হোক, বিষয়টা যখন এমনি গুরুতর, তখন এই বিবরণীটাকে নিংড়িয়েই যতটুকু তথ্য আবিষ্কার করা যেতে পারে,—আগে তাই পরখ করে দেখাই স্বাভাবিক।

এই বিবরণীর শেষ সংখ্যা বেরিয়েছে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে,—তাতে ১৯২৮ অবধি সব খবর সন্নিবেশ করা হ'য়েছে। এ থেকে দেখা যাবে যে, বর্ত্তমানে গোটা ভারতে মোট ১৮টা এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক কারবার চালাচ্ছে। বাঁ দিকের তালিকায় তাদের নাম ও সেই সঙ্গে তাদের দেনা ও সম্পত্তির আয়তন-সূচক একটা তালিকা জুড়ে দেওয়া গেল। তাতে ব্যাঙ্কগুলির ঘনিষ্ঠ পরিচয় না পেলেও, পরবর্ত্তী আলোচনার পক্ষে কিছু সুবিধা হ'তে পারে:—

---

*ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল্ টেবল্‌স্ রিলেটিং টু জয়েণ্ট ষ্টক্ ব্যাঙ্কস্ ইন্ ইণ্ডিয়া,—গভর্ণমেণ্ট কমার্শ্যাল ইনটেলিজেন্স বিভাগ হইতে প্রকাশিত বাৎসরিক বিবরণী।

এই এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির কোনটাই ভারতীয় কোম্পানী নয়। এদের হেড্ অফিস সবই ভারতবর্ষের বাইরে অবস্থিত র'য়েছে। ভারতবর্ষের মত আরও অনেক দেশে এদের শাখা অফিস আছে। তবে ভারতীয় কারবারের বহরটা কোন কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে তুলনা-মূলক ভাবে প্রধান, কারও পক্ষে বা অপ্রধান, এই যা তফাৎ। যে ব্যাঙ্কের সমষ্টি আমানতি টাকার শতকরা ২৫৲ ভারতবর্ষ থেকেই আদায় হয়, তার পক্ষেই ভারতীয় কারবারটাকে প্রধান বলা চলে; যে ব্যাঙ্কের ভারতীয় আমানত এই শতাংশ হিসেবের চাইতে কম তার স্থানীয় কারবারকে অপ্রধান বলে সমঝে নিতে হ'বে। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিবরণীতে এই দুই শ্রেণীর ব্যাঙ্ককে পৃথক করে দেখাবার জন্য প্রথম শ্রেণীকে 'এ'ক্লাস ও শেষোক্ত শ্রেণীকে 'বি'ক্লাস ব্যাঙ্ক আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে। এদের সম্বন্ধে তুলনা-মূলক ধারণা করে নেবার জন্য ডান দিকের পৃষ্ঠায় একটা তালিকা উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল।

মাত্র ১৮টা বিদেশী ব্যাঙ্কের ওপর গোটা ভারতের বহির্বাণিজ্য পোষণ করবার ভার ন্যস্ত র'য়েছে, অর্থাৎ এদের সহায়তা ছাড়া ভারতবর্ষের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য চালাবার উপায় নেই। এর মধ্যে ৮টা খাঁটি বৃটিশ ব্যাঙ্ক, ২টা ওলন্দাজ ব্যাঙ্ক; ১টা পর্ত্তুগীজ ব্যাঙ্ক; ২টা যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার ব্যাঙ্ক,—সম্প্রতি 'আমেরিকান এক্‌সপ্রেস কোম্পানী' 'ন্যাশানাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক'এর সঙ্গে যুক্ত হ'বার ফলে তা একটায় এসে দাঁড়িয়েছে; ১টা বৃটিশ পরিচালিত প্রতীচ্য ব্যাঙ্ক (হংকং এণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কিং করপোরেশন); ১টা ফরাসী ব্যাঙ্ক ও ৩টা জাপানী ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কগুলির দেশ পরিচয়ের তাৎপর্য্য এই নয় যে, শুধু যে সব দেশের ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষে শাখা প্রতিষ্ঠা

বৎসর	ব্যাঙ্কের সংখ্যা		মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড			আমানত		নগদ তহবিল	
			আদায়ী মূলধন ,০০০ বাদ (পাউণ্ড)	রিজার্ভ ফণ্ড ,০০০ বাদ (পাউণ্ড)	সমষ্টি ,০০০ বাদ (পাউণ্ড)	ভারতের বাহিরে ,০০০ বাদ (পাউণ্ড)	ভারতবর্ষে ,০০০ বাদ (টাকা)	ভারতের বাহিরে ,০০০ বাদ (পাউণ্ড)	ভারতবর্ষে ,০০০ বাদ (টাকা)
১৯২৮ (ডিসেম্বর)	'এ' ক্লাস,,	৬	৯,৭৬৯	১০,৮৩৪	২০,৬০৩	৬৮,৬৫১	৫০,০৭,২৫	৯,৩৭০	৫,৬৫,৮৫
	'বি' ক্লাস,,	১২	৮৬,০৩৪	৮১,২৮৬	১৬৭,৩২০	১,২৯০,১২৩ (একটা ব্যাঙ্ক বাদে)	২১,০৮,৬১	২২৭,২৫১ (একটা ব্যাঙ্ক বাদে)	২,৩৯,৭২
মোট		১৮	৯৫,৮০৩	৯২,১২০	১৮৭,৯২৩	১,৩৫৮,৮৭৪	৭১,১৩,৮৬	২৩৬,৬২১	৮,০৫,৫৭

করেছে, তাদের সঙ্গেই ভারতবর্ষের বাণিজ্য চলছে। একটা দেশের ব্যাঙ্কের সহায়তায় আরও পাঁচটা দেশ তাদের বহির্বাণিজ্য চালাতে সক্ষম হ'তে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ স্পেন কিংবা জার্ম্মাণীর নাম করা যেতে পারে। স্পেনের কোন ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষে শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করে নি, তবু বিলাতী ব্যাঙ্কের মারফৎ সে দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের ব্যবসা-সংক্রান্ত লেনদেন চলছে। জার্ম্মাণীও পূর্ব্বকথিত ওলন্দাজ ব্যাঙ্কের সহায়তায় ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষ এখন একটা পাকা বনিয়াদ গড়ে তুলেছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সঙ্গেই তার আমদানি-রপ্তানি কারবার চলছে। তবে কথা হ'ল এই যে, এই বিস্তৃত বহির্বাণিজ্যের জন্য যে টাকা দরকার, তা' অন্ততঃ আপাতঃভাবে যোগাচ্ছে আমাদের নব-পরিচিত মাত্র এই ১৮টা ব্যাঙ্ক। কি পরিমাণ টাকা যে এর জন্য প্রয়োজন হ'তে পারে, তা' ঠিক সমঝে না নিলে ব্যাপারটার তাৎপর্য্য মোটেই উপলব্ধি হবে না। ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের বহরটা সেজন্য একবার পরখ করে দেখা দরকার। নীচের তালিকায় সেটাই একটু বিন্যাস করে দেখানো হ'য়েছে :—

দেশ	আমদানি (টাকা)	রপ্তানি (টাকা)	সমষ্টি (টাকা)
ইংলণ্ড	১,১৩,২৪	৭২,৩৭	১,৮৫,৬১
বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশ	২৩,৯০	৪৭,৫৫	৭১,৪৫
সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য	১,৩৭,১৪	১,১৯,৯২	২,৫৭,০৬
যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা	১৭,৩৬	৩৯,৯৭	৫৭,৩৩
জাপান ...	১৭,৬৬	৩৪,৬১	৫২,২৭
ফ্রান্স ...	৪,৭৮	১৭,৯১	২২,৬৯
ইতালি ...	৭,৩৬	১৫,২৫	২২,৬১
পারস্য	৩,৮২	১,৯৯	৫,৮১
চীন ...	৪,৩২	৯,৪৮	১৩,৮০
তুরস্ক ...	......	২২	২২
জাভা ...	১৬,৪২	৩,৬৯	২০,১১
কিউবা ...	......	৩,৩৫	৩,৩৫
আর্জেন্টিনা ...	১৬	৮,০১	৮,১৭
ইন্দো-চীন ...	১,৯৫	১,৭০	৩,৬৫
চিলি ...	১০	১,৫৯	১,৬৯
স্পেন ...	২৭	৩,৯১	৪,১৮
রুষ ...	৮৫	২৫	১,১০
নেদারল্যাণ্ডস্ ...	৪,৭৭	৮,৭৩	১৩,৫০
বেলজিয়াম ...	৭,২০	১৩,৪৫	২০,৬৫
জার্ম্মাণী ...	১৫,৮৪	৩২,৪৮	৪৮,৩২
অষ্ট্রিয়া ...	১,৪০	৯	১,৪৯
ইজিপ্ট ...	৪৯	৩,৪৪	৩,৯৩
অন্যান্য দেশ ...	১১,৪১	১৭,৯২	২৯,৩৩
বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভুক্ত বিবিধ দেশের সমষ্টি	১১৬,১৬	২১৮,০৪	৩৩৪,২০
সর্ব্বসমষ্টি	২৫৩,৩০	৩৩৭,৯৬	৫৯১,২৬ *

* 'রিভিউ অব্ ট্রেড্ ইন্ ইণ্ডিয়া (১৯৩০)—গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত বাণিজ্য বিবরণী হইতে সংগৃহীত।

ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য এই প্রায় ছ'শ কোটি টাকা যোগাচ্ছে পূর্ব্বকথিত ১৮টা এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক। এর সঙ্গে আমাদের দেশী যৌথ-ব্যাঙ্কগুলি বা এমন কি ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের কোন সম্পর্ক নেই।

বাণিজ্য পোষণের ক্রিয়া-পদ্ধতি

ব্যাঙ্কগুলি ভারতের এই বিস্তৃত বহির্বাণিজ্য পোষণ করছে কি ভাবে, এবার সে সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক। বহির্বাণিজ্য পোষণের যে কলকাঠি দরকার, সেটা হচ্ছে 'বিল অব্‌ এক্‌সচেঞ্জ' বা পরদেশী বিল। এই কলকাঠিটার কেরামত বোঝবার জন্যই সংজ্ঞা-প্রকরণে এত বিনিয়ে বিনিয়ে পাঁচালী গাওয়া হ'য়েছে। সেখানে এর তাৎপর্য্যই শুধু বুঝতে চেষ্টা করা হ'য়েছে. এবার এর সত্যিকার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ক'লকাতার কোন মহাজন ডাণ্ডিতে পাট চালান দিয়েছে। চালান দিয়েই সে একটা দলিল-যোগ দর্শনী বিল লিখে, সেটা নিয়ে গেল কোন বিলাতী এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের ক'লকাতার শাখা-অফিসে। এ কাজটা সে নিজেই করতে পারে বা কোন এক্‌সচেঞ্জ দালালের সহায়তায়ও করাতে পারে। বিলটায় মূল্য লেখা হবে বিলাতী মুদ্রায়, কারণ তার মূল্যটা ত আদায় হবে সেখানেই,—ডাণ্ডির আমদানিকারের কাছ থেকে। এ দেশের রপ্তানি-বিলগুলি এই পদ্ধতিতেই লেখবার নিয়ম,— আর তা করতেও মুস্কিল হ'বার কোন কারণ নেই। ভারতবর্ষের 'চলৎসিক্কা' টাকার একটা নির্দ্দিষ্ট স্বর্ণ-মূল্য থাকবার জন্য অন্য সব দেশের চলৎসিক্কার সঙ্গেই এর একটা বিনিময়-সম্বন্ধ আছে। বিদেশী মুদ্রার অঙ্কে রপ্তানি-বিল লিখতে গেলে এই বিনিময়-হার

অনুসারেই তা' করতে হয়। বর্ত্তমান বিনিময়-হার অনুসারে ভারতীয় টাকা ইংলণ্ডের ১ শিলিং ৬ পেন্সের সমান। অন্যান্য দেশের মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময়-হার কি হবে, তা' যে কোন ভাল খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেই দেখতে পাওয়া যাবে। ভারতীয় টাকার বিনিময়-হার সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর এদেশের 'স্বর্ণ-বিনিময় মান' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েই দেওয়া হ'য়েছে।

এখন এই রপ্তানি-বিলটার শেষে কি হ'বে তাই দেখা যাক। রপ্তানিকার বিলটা নিয়ে যাবে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের কাছে। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক বিলের আনুষঙ্গিক দলিল পত্র যথাযথ আছে কিনা দেখে, তার মূল্যের ওপর বাটাসুদ কেটে দামটা দিয়ে দেবে রপ্তানিকারকে। এই বাটাসুদ কেটে বিল কেনাকে বাজার-চলতি ভাষায় বিল 'ডিস্কাউন্ট' করা বলে। বাটাসুদের হারটা নির্ভর করবে স্থানীয় ব্যাঙ্ক-মহলের চলতি সুদের ওপর। ব্যাঙ্ক মহলে চলতি সুদ বলতে আমানতের ওপর দেয় সুদ ও কর্জ্জের ওপর দেয় সুদ, দুইই বোঝায় বটে, তবু ব্যবহার সূত্রে বিলবাট। সম্পর্কে যখনই বাজার-সুদএর কথা বলা হয়, তখনই কর্জ্জের ওপর প্রাপ্য সুদএর কথা বলা হচ্ছে, বুঝতে হবে। স্থানীয় বাজার সুদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের বাটাসুদের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এই জন্য যে, ব্যাঙ্কের তরফ থেকে দেশী বাজারে হাওলাত দেওয়া আর রপ্তানি-বিল কেনা দুটোই টাকা লগ্নী করবার ব্যাপার। কাজেই এই দু'রকম লগ্নীর ওপর অন্ততঃ সুদ হিসেবে কোন বৈষম্য না থাকাই স্বাভাবিক।

রপ্তানি-বিল কেনবার ফলে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের কলকাতা-শাখায় টাকার তহবিল ফুরিয়ে আসবে, একথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

বিলটার মূল্য আদায় হবে লণ্ডনে,—কাজেই সেখানকার শাখা-অফিসে বা সেটা যদি ব্যাঙ্কের হেড-অফিস হয়, ত সে হেড-অফিসেই ব্যাঙ্কের পাউণ্ড ষ্টারলিংএর তহবিল বেড়ে যাবে। এইখানেই প্রশ্ন উঠবে যে, রপ্তানি-বিল কিনতে যদি ব্যাঙ্কের টাকা ফুরোতেই থাকে, তবে ত শেষ পর্য্যন্ত তার কারবারই বন্ধ করে দিতে হ'বে,—তার ত একটা অফুরন্ত টাকার ভাণ্ডার থাকতে পারে না। তা নেই বটে, কিন্তু সত্যি করেই তার টাকা ফুরোয় না। তার কারণ হ'ল এই যে, বিলেতে যখন আবার ব্যাঙ্কের শাখা সেখানকার কোন রপ্তানিকারের কাছ থেকে ভারতবর্ষের কোন আমদানিকারের কাছ থেকে প্রাপ্য বিল কেনে, তখন বিলাতী শাখার পাউণ্ডের তহবিল কমে যায় বটে, কিন্তু সেই বিলের মূল্যটা এদেশে আদায় হয় বলে স্থানীয় শাখায় টাকার তহবিল বাড়ে। ভারতবর্ষের তরফ থেকে এই শেষোক্ত বিলগুলিকে আমদানি-বিল বলা যেতে পারে। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা জোয়ার-ভাটার মত। রপ্তানি-বিল কিনতে তহবিল ফুরোয়,—আমদানি-বিলের আদায়ে আবার সেই তহবিলই বাড়ে। শুধু আমদানি-বিলেই নয়, তহবিল বাড়াবার আর একটা উপায় আছে। ভারতীয় আমদানি-বাণিজ্যে সাধারণতঃ রপ্তানিকারই বিদেশ থেকে বিলটা লিখে বিক্রী করে, তাই আমদানিকারের কাছ থেকে বিলের মেয়াদ ফুরোলে স্থানীয় শাখা-অফিস মূল্য আদায় করে। এই পদ্ধতি ছাড়াও আমদানিকারের পক্ষে দেনার টাকা দেবার একটা উপায় আছে। সে নিজেই হয় ত তার বিদেশী পাওনাদারকে টাকা পাঠাবার আয়োজন করতে পারে। ব্যাঙ্ক সে ক্ষেত্রে বিদেশী মুদ্রায় নিজেরই বিদেশী শাখার ওপর একটা আদেশ-পত্র লিখে সেটা আমদানিকারের কাছে বিক্রী করতে পারে।

এরকম আদেশ-পত্রকে বাজার চলতি ভাষায় 'ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট বা ব্যাঙ্ক-বিল অর্থাৎ ব্যাঙ্ক-চিঠি বলে। এই ধরণের ব্যাঙ্ক-চিঠার সহায়তায় যাঁরা ব্যবসায়ী নন, তাঁরাও বিদেশে টাকা পাঠিয়ে থাকেন। বলা বাহুল্য, এ রকম ব্যাঙ্ক-চিঠা বিক্রী করেও আমদানি-বিলের মতই স্থানীয় শাখা-অফিসের নগদ তহবিল বাড়ে। এইখানে কথাটা বলে রাখা ভাল যে, ভারতবর্ষে রপ্তানি-বিলের মত আমদানি-বিলগুলিও বিদেশী মুদ্রার অঙ্কে লেখা হ'য়ে থাকে। সেগুলি এদেশে আসবার পর তাদের মেয়াদ ফুরোবার দিন এক্‌সচেঞ্জ বাজারে অর্থাৎ এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক-মহলে যে বিনিময়-হার প্রবল থাকে, সেই হার অনুসারে তার মূল্য টাকায় গুণে দিতে হয়।

এক্‌সচেঞ্জ ব্যবসায়ে মূলধন ৭৫ কোটি টাকা

এক্‌সচেঞ্জ ব্যবসায়ে যে ক্রিয়া-পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাঙ্কগুলি ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য পোষণ করছে, তার মর্ম্ম খানিকটা বোঝা গেল। এ কথা বোঝা গেছে যে, আমদানি-রপ্তানির বহর সমান হ'লে রপ্তানি-বিল কেনবার টাকা শেষ পর্য্যন্ত আমদানি বিলের মূল্য থেকেই আদায় হ'তে পারে। কিন্তু "শেষ পর্য্যন্ত" তা হ'লেও একথা ঠিক যে, গোড়ায় রপ্তানি-বিল কেনা সুরু করে দেবার জন্য ব্যাঙ্ককে কিছু মূলধন নিয়ে বসতে হ'বেই। শেষে না হয় আমদানি-বিলের আদায় থেকেই কাজ চালানো সম্ভব হ'ল। গোড়াকার কাজের জন্যই ভারতবর্ষের ১৮টা এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের কি পরিমাণ মূলধন দরকার হ'তে পারে, তাই একবার খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করা যাক। সমস্যাটাকে সহজে সমাধান করে নেবার জন্য একটা ব্যাপার ধরে নেওয়া যেতে পারে। আমদানি এবং রপ্তানি ত একদিনেরই ব্যাপার নয়,—এ ত সারা বছর

ব্যেপেই চলবে; কাজেই সে বিষয়ে মেনে নেওয়া যাক যে, এই উভয় প্রকার বাণিজ্যের বিভাগ ও প্রবাহ-গতি একই রকমের,—অর্থাৎ ফি সপ্তাহে বা মাসে একই পরিমাণ আমদানি এবং রপ্তানি হচ্ছে। এইবার আমাদের ঈপ্সিত হিসেবটা করা সহজ হবে। ভারতবর্ষে যে সব আমদানি-বিল আসে সেংগুলোর মেয়াদ গড়ে প্রায় তিন মাস হবে। মেয়াদী তিন মাসের মধ্যে বিলের টাকা আদায় হ'বার সম্ভাবনা নেই। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, গোড়ায় ব্যবসা স্বরু করতে এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্ককে এই তিন মাসের টাকা মজুদ নিয়ে বসতে হবে রপ্তানি-বিল কেনবার জন্য; তারপর না হয় আমদানি-বিলের আদায় থেকে কাজ চলবে। এখন এই তিনমাসের মজুদ টাকার হিসেব চাই। অঙ্কের হিসেবে তিন মাস কাল একটা পুরো বৎসরের ¼ ভাগ। রপ্তানির প্রবাহ-গতি ও বিভাগ যদি সমান মেনে নেওয়া হয়, তা হ'লে এই ¼ বৎসরের জন্য প্রয়োজনীয় মজুদ টাকার পরিমাণ হবে, বৎসর ব্যাপি রপ্তানির সমষ্টি মূল্যেরই ¼ ভাগ। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের রপ্তা[নি]-বাণিজ্যের গড়পড়তা সমষ্টিমূল্য হ'ল প্রায় ৩০০ কোটি টাকা,—তার ¼ ভাগের পরিমাণ হবে ৭৫ কোটি টাকা। এই ৭৫ কোটি টাকা চাই তিন মাসের মজুদ। এই মজুদ সম্বল করেই গোটা ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যের টাকা যোগানোর দায়ীত্ব ঘাড়ে তুলে নেওয়া যেতে পারে।

এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের মূলধনের কেরামত

ভারতবর্ষের এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলিকে তা হ'লে এই ৭৫ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। কিন্তু এই মূলধনের টাকাটাই কি এই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি সত্যি করে এনেছে? ভারতবর্ষে

এদের কত মূলধন খাটে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণীতে তার কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না। সেখানে যে মূলধনের অঙ্ক দেখানো হয়, সেটা হচ্ছে সমস্ত শাখাসমেত ব্যাঙ্কের মূলধন,—তার কতটা কোন শাখায় খাটছে, তা বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু তবু এই বিবরণীতেই যা পাওয়া যায়, তা একটু কায়দা-মাফিক ছাচে ফেলতে পারলেই এ সম্বন্ধে আর কোন রহস্য থাকবে না। নীচের তালিকায় তাই দেখানো হ'য়েছে :—

ভারতীয় ১৮টা এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

বৎসর	মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা	ভারতে গৃহীত আমানত (টাকা)
১৯২০	১,২০,২৮,৯৩,০০০৲	৭৪,৮০,৭১,০০০৲
১৯২১	১,৪৮,৮৪,২৭,০০০৲	৭৫,১৯,৬১,০০০৲
১৯২২	১,৪৯,৬২,৭৫,০০০৲	৭৩,৩৮,৪৪,০০০৲
১৯২৩	১,৮৬,৮০,৪০,০০০৲	৬৮,৪৪,২৮,০০০৲
১৯২৪	১,৭৩,৯৫,২০,০০০৲	৭০,৬৩,৪৮,০০০
১৯২৫	১,৮৪,৪১,৪৭,০০০৲	৭০,৫৪,৫৭,০০০৲
১৯২৬	১,৯৭,৩৩,৭৩,০০০৲	৭১,৫৪,২২,০০০৲
১৯২৭	২,৪১,২২,৬০,০০০৲	৬৮,৮৬,২৩,০০০৲
১৯২৮	২,৫০,৫৬,৪০,০০০৲	৭১,১৩,৮৬,০০০৲

ভারতীয় রপ্তানি-বাণিজ্য পোষণ করতে মজুদ চাই ৭৫ কোটি টাকা,—কিন্তু সে টাকা ত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি ভারতবর্ষে গৃহীত আমানত থেকেই সংগ্রহ করে নিচ্ছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এদের গৃহীত

আমানতের পরিমাণ ৭৫ কোটি টাকাও অতিক্রম করে গিয়েছিল। এর পরেও কি এদের নিজ নিজ দেশ থেকে মূলধন আনিয়ে ব্যবসা চালাবার দরকার হ'তে পারে? মাছের তেলে মাছ ভাজা আর কাকে বলে?

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের লাভের বহর

এর পরেই একটা প্রশ্ন মনে জাগবে যে, এই বিনা মূলধনের ব্যবসা করে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি তাদের ভারতীয় কারবার থেকে লাভ করছে কত। এ সম্বন্ধেও গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণীতে কোন খবর পাওয়া যাবে না। মূলধনের মত এদের লাভ লোকসান সম্বন্ধেও তাতে যে খবর পাওয়া যাবে, তা ব্যাঙ্কগুলির সমষ্টি কারবার সম্বন্ধে প্রযোজ্য;—ভারতীয় কারবারের লাভ লোকসান সম্বন্ধে পৃথক কোন অঙ্ক তাতে দেওয়া নেই। অথচ এ সম্বন্ধে একটা আনুমানিক হিসেব না পেলেও একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার আমাদের কাছে রহস্যই থেকে গেল, বুঝতে হবে। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয় এক্সচেঞ্জ ব্যাবসাটাকে একচেটিয়া দখলে রাখবার জন্য কি পরিমাণ লাভের টাকা বেহাত হ'য়ে যাচ্ছে, তা বোঝবার কোন পথই থাকবে না। আর তা' না বুঝতে পারলে জাতীয় উদ্যমও আত্মপ্রকাশ করবার একটা প্রেরণা পাবে না। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি এ কথাটি বেশ ভাল করে বুঝে নিয়েছে বলে তারা এমন কোন বিবরণীই প্রকাশ করে না, যা থেকে এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও আঁচ পাওয়া যেতে পারে। ইদানীং দেশের নেতা ও ধনবিজ্ঞানবিৎদের এ বিষয়ে একটু নজর পড়েছে। কিন্তু যখনই তাঁরা এমন কিছু বলেন যে, বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত বুলিয়েই লাখ

লাখ টাকা রোজগার করে নিচ্ছে, তখনই একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি তুমুল প্রতিবাদ সুরু করে প্রতিপন্ন করতে চায় যে, পরস্পর প্রতিযোগিতার চাপে লাভ ত দূরে থাকুক, এখন তাদের লোকসানেরই দায় সামলাতে হচ্ছে। এই প্রতিবাদের জবাব দেওয়া কঠিন। ব্যাঙ্ক-গুলি যখন তাদের ভেতরকার কোন খবরই দেবে না, তখন কাগজে কলমে তাদের কথা মিথ্যা প্রমাণ করা দুঃসাধ্যই হ'য়ে পড়ে।

একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি যে তাদের ভারতীয় কারবারের কোন নিকাশ-পত্র বের করে না, এ কথা কারো কারো জানা নাও থাকতে পারে। কাজেই এ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা অবান্তর হবে না। ভারতীয় যৌথ-কোম্পানী সম্বন্ধে এ দেশে যে আইন কায়েম করা হ'য়েছে, সেই আইন অনুসারে প্রত্যেক দেশী যৌথ-ব্যাঙ্ককে একটা বার্ষিক বিবরণী পেশ করতে হয়; তাতে ব্যাঙ্কের গোটা বছরের লাভ লোকসানের হিসেব ও তার দেনা এবং সম্পত্তির নিকাশ-পত্র দুইই থাকে। গভর্ণমেণ্টের সনন্দ-প্রাপ্ত অডিটর অর্থাৎ হিসাব-পরীক্ষক বাৎসরিক হিসেব পাশ করলে তারই একটা নকল অডিটরের দস্তখত সহ গভর্ণ-মেণ্টের কর্ম্মচারী 'রেজিষ্ট্রার অব্ জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীস' এর কাছে পেশ করতে হয়। এই আইন বিদেশী কোন যৌথ-কোম্পানী বা ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। তাদের কারবারের বিবরণী পেশ করা সম্বন্ধে আলাদা করে কোন বিশেষ আইনও করা হয় নি। বাধ্য-বাধকতার ব্যাপার না থাকলে নিজের গরজে কোন ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানই তার হিসেব-পত্র প্রকাশ করতে চায় না; বিশেষ করে কোন রকম স্বার্থ-সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকলে ত নয়ই। একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি বেশ বুঝে নিয়েছে যে, তাদের একচেটিয়া-দখলী ব্যবসাটাকে ভারতবাসী খুব স্নেহের চোখে দেখছে না। এমতাবস্থায় তাদের ভারতীয় কারবারের

লাভের বহরটা প্রকাশ হ'য়ে পড়লে যে তাদের বিরুদ্ধে একটা বিরাট হৈ চৈ পড়ে যাবে, এ কথা সমঝে নিতে তাদের দেরী হয় নি। তাই তারাও ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে চলছে, আমরাও আঁধার ঘরে ঘরময় সাপ দেখে বেড়াচ্ছি।

কোন রকম বিবরণীয় সাহায্য যখন পাওয়া যাবেই না, তখন এ বিষয়ে চেষ্টা থেকে নিরস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা হ'লে সমস্যাটার খাঁটি পরিচয়ই বা পাওয়া যাবে কি করে? অনুমান-হিসেব নিছক সত্য নয় বটে, কিন্তু সে জন্য তার কোন মূল্য নেই, এ কথাও সত্য নয়। পৃথিবীতে সব বড় বড় সমস্যার সমাধানের উৎসই হচ্ছে অনুমান। কাজেই এ বিষয়েও একটা অনুমান হিসেব তৈরী করবার চেষ্টা করলে তা অর্ব্বাচীনতার কাজ হবে না নিশ্চয়ই। এখন অনুমান হিসেবের পদ্ধতিটা কি হ'বে, তাই আলোচনা করা যাক।

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের সঙ্গে দেশী ব্যবসায়ীদের বিল বিক্রী বা ব্যাঙ্ক-চিঠা কেনবার জন্য প্রায়ই আগাম-চুক্তি হয়। একই পক্ষ থেকে এই দু'রকম চুক্তির প্রস্তাব অনেক সময়ই আসে। একে বাজার চল্‌তি ভাষায় "ওপেন মার্কেট ক'ভার অপারেশন" বা এক্‌সচেঞ্জ বাজারে কেনাবেচার দু'মুখো চুক্তি বলা হ'য়ে থাকে। এ রকম কারবারে ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ টাকা পিছু ৩/৪ পেনি লাভ করে থাকে। এই হিসেবটা করা হ'য়েছে ব্যাঙ্কের 'টেলিগ্রাফিক্ ট্রান্‌সফার' (অর্থাৎ তারযোগে টাকা স্থানান্তরিত করবার আদেশ) এর ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্যের যা পার্থক্য, তারই ওপর। টেলিগ্রাফ্ মনি অর্ডারের সঙ্গে সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। বিদেশেও এমনি করে টাকা পাঠানো সম্ভব। সেটা সম্ভব হয় এই ব্যাঙ্কেরই মারফতে। কেউ এমনি করে টাকা পাঠাতে চাইলে ব্যাঙ্ক ক্রেতার বিদেশী প্রাপককে চুক্তি মাফিক টাকা অবিলম্বে

দেয় বলে তার বিদেশী শাখাকে আদেশ দিয়ে টেলিগ্রাম করে। সাধারণ ব্যাঙ্ক-চিঠার সঙ্গে এর এই তফাৎ যে, এ ক্ষেত্রে কোন সময়-সাপেক্ষ দলিল প্রস্তুত করে ডাক-জাহাজে পাঠানো হয় না। তার-যোগে এ রকম টাকা স্থানান্তরিত করবার সুযোগ ব্যাঙ্কের পক্ষেই দেওয়া স্বাভাবিক, কারণ বিদেশে তার শাখা অফিস আছে। তবে এ রকম সুযোগ আর কারও যদি থাকে, তবে ব্যাঙ্ক তার কাছ থেকে এ ধরণের তারযোগে টাকা দেওয়ার আদেশ কিনে নিতেও রাজী থাকে ;—নিয়ে তাই হয় ত আবার কোন প্রেরণকারীর কাছে বিক্রী করে। আদেশ কিনে নেওয়ার অর্থ হ'ল আদেশ অনুযায়ী বিদেশী মুদ্রা কিনে নেওয়াই, আর কিছু নয়। বিনিময়-হারের ব্যাপারটা তা হ'লে স্বভাবতঃই এর মধ্যে এসে পড়ে। এ রকম 'টেলিগ্রাফিক ট্রানস্ফারের' পৃথক ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্য আছে। বিল-বাজারে এই ক্রয় মূল্যকে বলে "টি টি" র ক্রয় মূল্য এবং এর বিক্রয় মূল্যকে বলে "টি টি" র বিক্রয় মূল্য। ইংরেজি 'টেলিগ্রাফের' আদ্য অক্ষর 'টি' এবং 'ট্রানস্ফারের' আদ্য অক্ষর 'টি' একত্রিত করে সংক্ষেপে জিনিষটাকে বোঝাবার জন্যই 'টি টি' কথাটার ব্যবহার হ'য়ে থাকে। বলা বাহুল্য, ব্যাঙ্ক 'টি টি' র ক্রেতা এবং বিক্রেতা দুইই হ'তে পারে ; তবে বিক্রয়ের তুলনায় ক্রয় করাটা নেহাতই গৌণ ব্যাপার, কারণ ব্যাঙ্ক ছাড়া কারো পক্ষে 'টি টি' বিক্রয় করা অসাধারণ ব্যাপার বলেই বুঝে নিতে হবে ;—তা ছাড়া ব্যাঙ্ক যে 'টি টি' খরিদ করে, সে ত তার খদ্দের কোন প্রেরণকারীর কাছে বিক্রী করবার জন্যই।

ওপরের $\frac{3}{16}$ পেনির হিসেব করতে যে সময়-সাপেক্ষ বিলের ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য না নিয়ে 'টি টি' র ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য নেওয়া হ'য়েছে, তার একটা কারণ আছে। সময়-সাপেক্ষ

বিলের মূল্যে সুদের ব্যাপার আছে। এই সুদের হারটা আমদানি এবং রপ্তানি বিলের ওপর সমান নয়। কাজেই বিলের মেয়াদের ওপর প্রাপ্য সুদের ব্যাপার ছেড়ে নিছক মুদ্রা-বিনিময়ের জন্যই ব্যাঙ্ক কত লাভ করছে, তা বুঝতে হ'লে এই 'টি টি' র ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য থেকেই ধরা পড়বে। এই পার্থক্যটা যে কম পক্ষে ৩/১৬ পেনি হ'য়ে থাকে, তা দৈনিক খবরের কাগজে যে এক্সচেঞ্জ বাজারের বিনিময়-হারের তালিকা বেরোয়, সেটা পরখ করলেই প্রমাণ হবে।

ভারতবর্ষে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশী হলেও ব্যাঙ্ক মারফৎ যে পরিমাণ টাকার আদান প্রদান চলে তার মধ্যে একটা সাম্য আছে। পুস্তকের সংজ্ঞা বিভাগে দেখানো হ'য়েছে যে রপ্তানি-বিলের মূল্য আমদানি মালের দাম অতিক্রম করে গেলেও ভারত-গভর্ণমেণ্ট নিজেই বিল-বাজারে 'পাউণ্ড ষ্টারলিং' কিনে পাঠাবার বন্দোবস্ত করবার জন্য বিলমারফৎ পরদেশী মুদ্রার টান-যোগানের মধ্যে একটা সমতা রক্ষা হচ্ছে। অর্থাৎ ব্যবসায়ীক রপ্তানি-বিলের পরিমাণ যাই হোক, ভারতবর্ষের টাকার বাজারে বিদেশী মুদ্রার টান-যোগান সমান অর্থাৎ প্রায় তিন শ' কোটি টাকা। এরই ওপর লাভ লোকসানের বহরটা নির্দ্ধারণ করতে হবে। এর সবটাই যে কেনা বেচার আগাম দু'মুখো চুক্তিতে বিনিময় হ'য়ে থাকে, তা নয়; কারণ অনেক রপ্তানি-বিল ব্যাঙ্ক হয় ত কিনে নেয় না, শুধু আদায়-চুক্তিতে গ্রহণ করে মাত্র। অনুমান ক্ষেত্রে এ রকম আদায়-চুক্তি বিলের পরিমাণ সমষ্টি রপ্তানি-বিলের এক তৃতীয়াংশ ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ রকম বিলের ওপর ব্যাঙ্ক টাকা প্রতি ১/১৬ পেনি হিসেবে কমিশন আদায় করে থাকে। তার পর আমদানি-বিলের ওপর দায়-স্বীকার

করবার জন্যও ব্যাঙ্কের একটা কমিশন রোজগার হয়,—এই কমিশনের নির্দ্ধারিত হার হ'ল শতকরা $\frac{১}{৮}$ টাকা। সব আমদানিকারের জন্যই যে ব্যাঙ্কের এ রকম দায়-স্বীকার করবার দরকার হয়, তা নয়। ভারতবর্ষের আমদানি-বাণিজ্যের একটা মোটা ভাগ রয়েছে স্থানীয় বিদেশী ফার্ম্মগুলির হাতে; এদের পক্ষে ব্যাঙ্কের দায়-স্বীকার দরকার নাও হ'তে পারে। কিন্তু ভারতীয় আমদানিকার মাত্রই কোন ব্যাঙ্কের দায়-স্বীকারের ওপর ভর করে কারবার চালাতে বাধ্য হয়। সুতরাং আনুমানিক হিসেবে আমদানি-মূল্যের সমষ্টি পরিমাণের অর্দ্ধেক দেড়শ' কোটি টাকার ওপর যে এ রকম কমিশন আদায় হয়, তা ধরে নিলে খুব ভুল হবে না। তা ছাড়া আর একটা রোজগারের হিসেব ধরে নেওয়া হয় নি;—পাউণ্ড ষ্টারলিং কেনাবেচার দু'মুখো চুক্তি হ'লেই ক্রয় এবং বিক্রয়মূল্যের হারের পার্থক্যজনিত লাভ হয় টাকা পিছু $\frac{১}{৩২}$ পেনি; যদি ক্রেতা এবং বিক্রেতা পৃথক পক্ষ হয়, তা হ'লে ব্যাঙ্ক ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় পক্ষর কাছ থেকেই $\frac{১}{৩২}$ পেনি আদায় করে টাকা পিছু $\frac{১}{১৬}$ পেনি লাভ করে। দু'মুখো চুক্তির পরিমাণ দুশ' কোটি টাকা ধরলে একশ' কোটি টাকার সম পরিমাণ পাউণ্ড অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে $\frac{১}{১৬}$ পেনি হিসেবে লাভ আদায় হ'তে পারে, বুঝতে হবে। বিক্রেতা এ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক নিজেই; সুতরাং শুধু ক্রেতার কাছ থেকে যে $\frac{১}{৩২}$ পেনি আদায় হবে, কেবল সেটাই আলাদা করে লাভের হিসেবে ঢুকবে, কারণ বিদেশী রপ্তানি-বিলের পুরো হিসেবটা আমরা আগেই ধরে নিয়েছি;—তার দুশ' কোটি গেছে দু'মুখো চুক্তি বাবদ, আর একশ' কোটি গেছে আদায়-চুক্তি হিসেবে। এ সমস্তই গেল ব্যাঙ্কের লাভের ব্যাপার। খরচের

ব্যাপারটা তর্কেও ধরা হয় নি। ব্যাঙ্কের সঙ্গে যে সর্ব্বদাই আমদানি এবং রপ্তানিকার অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার ক্রেতা এবং বিক্রেতার সঙ্গে সোজাসুজি কারবার চলে, তা নয়। অনেক সময়ই তাকে দালালের মারফৎ কাজ চালাতে হয়; তবে খুব বেশী করে ধরলেও সাধারণতঃ এ রকম কারবারের পরিমাণ যে সম্পূর্ণ কারবারের অর্দ্ধেক অতিক্রম করে না, এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। দালালির হার হচ্ছে শতকরা ১/১৬ টাকা; এটা ব্যাঙ্ককেই দিতে হয়।

এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আয়-ব্যয়ের তা হ'লে একটা আনুমানিক হিসেব পাওয়া গেল। এবার এই হিসেবটা অঙ্কের ছাঁচে ফেলে দেখা যাক যে, ব্যাঙ্কগুলি সত্যি করে তাদের ভারতীয় এক্‌সচেঞ্জ কারবার থেকে কত লাভ করতে পারে।

আয় (১) বিলমারফৎ পাউণ্ড অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে
দু'মুখো চুক্তির দরুণ লাভ . ২০০ কোটি টাকার ওপর
টাকা প্রতি ১/৩২ পেনি হিসেবে ৩৫ লক্ষ টাকা।

(২) আদায়-চুক্তি বিলের ওপর
কমিশন আদায় ১০০কোটি টাকার ওপর
টাকা প্রতি ১/১৬ পেনি হিসেবে . . ...৩৫ " "

(৩) দায়-স্বীকারে কমিশন আদায়......১৫০ কোটি
টাকার ওপর শতকরা ¼টাকা হিসেবে......৩৭½ " "

(৪) পাউণ্ড অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার একমুখো বিক্রয়
১০০ কোটির ওপর
টাকা প্রতি ১/৩২ পেনি হিসেবে. ....১৭½ " "

মোট আয় ১২৫ লক্ষ টাকা।

ব্যয় দালালি খরচ দরুণ ব্যয়
১৫০ কোটি টাকার ওপর
শতকরা ১/১৬ টাকা হিসেবে......(প্রায়) ৯ লক্ষ টাকা। *

মোট আয় ১১৬ লক্ষ টাকা।

---

* "রুল্‌স্ অব্ বিজনেস্ অ্যাগ্রিড্ টু অ্যাট্ ভ্যারিয়াস টাইম্‌স বাই দি ম্যানেজার্স অব্ দি এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কস্ ইন্ ক্যাল্‌কাটা"—নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে যে, এই হিসেবগুলির মধ্যে মেয়াদী বিলের ওপর ধার্য্য সুদটাকে বাদ দেওয়া হ'য়েছে। নিছক বিনিময়ের লাভটাকে সুদের আদায় থেকে পৃথক করে দেখা যেতে পারে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাই করা হ'য়েছে।

এই ১১৬ লক্ষ টাকাই যে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের একমাত্র রোজগার, তা নয়। মেয়াদী বিলের ওপর সুদের আদায় থেকেও তার একটা মোটা রোজগার হয়। সেটা কি করে সম্ভব হয়, তা' একটু বাড়িয়ে বলা দরকার। ব্যাঙ্কগুলি যে কারণেই হোক,—বেশ অল্প সুদে আমানত নিতে পাচ্ছে। কিন্তু মেয়াদী রপ্তানি-বিলের ওপর যে সুদটা ধরা হয়, তা বিলটা বিদেশে না পৌছানো পর্য্যন্ত এখানে ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কএ প্রদত্ত কর্জ্জের ওপর ধার্য্য যে সুদের হার প্রবল থাকে, সেই সুদের হার অনুসারে আদায় করা হ'য়ে থাকে। বিলটা বিদেশে পৌছাবার পর মেয়াদের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সুদের হার নির্দ্ধারিত হয় সেখানকার বাজার চলতি সুদ অনুসারে, কারণ বিলটা সেখানে পৌছালেই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস তা বিল-বাজারে বিক্রী করে ফেলে; কাজেই অসমাপ্ত মেয়াদকালের ওপর প্রাপ্য সুদের দরুণ ব্যাঙ্কের লাভ লোকসানের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু বিলটা বিদেশে না পৌছানো পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক যে ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের ধার্য্য সুদ আদায় করে নেয়, তাতেই তার একটা লাভ থাকে। এই লাভ ছাড়াও ব্যাঙ্কের সুদ আদায়ের দরুণই আরও বিস্তর রোজগার আছে। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি সম্পূর্ণ এক্সচেঞ্জ কারবারটাকে তাদের একচেটিয়া দখলে রেখেই তৃপ্ত হয় নি। আজকাল তারা বিস্তৃত ভাবে দেশের মধ্যেই ব্যাঙ্কের কারবার চালাচ্ছে। সে জন্য স্থানীয় বিদেশী ব্যবসায়ী বা মিল কারখানাকে টাকা ধার দেওয়া তাদের এখন

নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত ব্যাপার হ'য়ে পড়েছে। এই সমস্ত রোজগারের আয় খতিয়ে দেখলে ব্যাঙ্কগুলির রোজগার যদি আরও প্রায় ৫০।৬০ লক্ষ টাকাতে গিয়ে দাঁড়ায়, তা হ'লে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এই হিসেবে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির ভারতীয় কারবার থেকে লাভ আদায়ের বহর যা দাঁড়ায়, তা দেড় কোটি থেকে প্রায় দু'কোটির সামিল হবে।

বিদেশী ব্যাঙ্ক ও দেশী ব্যবসার কদর

বিদেশী এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে তা হ'লে মোটামুটি দুটো খবর পাওয়া গেল ;—প্রথম কথা হচ্ছে, এরা যে পরিমাণ মূলধন নিয়ে কারবার চালাচ্ছে, তার পক্ষে ভারতে গৃহীত আমানতের টাকাই যথেষ্ট. দ্বিতীয় কথা, এদের লাভের বহর দেড় কোটি থেকে প্রায় দু' কোটির সামিল। এত বড় একটা লাভজনক কারবার যে দেশের লোকের আমানতি টাকার জোরে চলা সত্ত্বেও বিদেশীয়দের একচেটিয়া দখলেই র'য়ে গেছে, এটা দেশের পক্ষে কম দুর্ভাগ্যের কথা নয়। সে যা হোক, এবার এই ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের কতটা সহায়তা করছে তাই খতিয়ে দেখা যাক। আজকাল দেশাত্মবোধ জাগাতে দেশী ব্যবসায়ীরা সব বিষয়ই একটু খুঁটিনাটি করে দেখতে আরম্ভ করেছেন। তাই ইদানিং এই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে তাঁদের নালিশ ক্রমশঃই মুখর হ'য়ে উঠছে। এই নালিশগুলি যাচাই করে তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির কেরামত প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। এবার তা হ'লে এ বিষয়েই মনোযোগী হওয়া যাক।

এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে দেশী ব্যবসায়ীদের প্রথম নালিশ এই যে, এই ব্যাঙ্কগুলি পদে পদে তাদের সঙ্গে পক্ষপাত-মূলক ব্যবহার করে

থাকে ; এমন কি সামান্য 'ব্যাঙ্ক-রেফারেন্স' বা 'ব্যাঙ্ক অভিমতপত্র' দেওয়া নিয়েও। দেশী ব্যবসায়ী এই অভিমত চাইলেই ব্যাঙ্ক নানা রকম তাল বাহানা করতে আরম্ভ করে। বিদেশী কোন সামান্য ব্যবসায়ী বা ফার্ম্মও এ রকম অভিমত চাইলে, তারা কোন রকম দ্বিধা প্রকাশ না করেই তা দিয়ে থাকে ; অথচ যত বড়ই হোক না কেন, কোন দেশী ব্যবসায়ী তা' চাইলেই যত কৈফিয়ৎ তলবের দরকার হ'বে। বর্ত্তমান ব্যাঙ্ক-জগতে আজকাল যে লৌকিকতার প্রথা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তাতে কেউ ব্যাঙ্কের অভিমত চাইলে ব্যাঙ্ক আগ্রহ করেই তা দিয়ে থাকে। এজন্য একটু খোঁজ খবর করতে হ'লেও তারা সে শ্রমটুকু স্বীকার করতে কুণ্ঠা প্রকাশ করে না। কিন্তু এ দেশের বেলায় সবই উল্টো,— অবশ্য যদি কোন দেশী ব্যবসায়ী সম্বন্ধে অভিমত চাওয়া হয়। এ রকম দেশী ব্যবসায়ী সম্বন্ধে খবর চেয়ে পাঠালে, যদি এমন হয় যে, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না, তা হ'লে তারা "আমরা কিছু জানি নে বাপু", এমনি একটা চাঁচা ছোলা জবাব দিয়েই তাদের কর্ত্তব্য শেষ করে। যদি বা তাদের কিছু জানা থাকে, তা হ'লেও তারা এমনি ইনিয়ে বিনিয়ে একটা 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' গোছের জবাব দেবে, যাতে দেশী ব্যবসায়ীর পক্ষে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশী। এমনি ব্যবহারটা যে একেবারে বিজাতীয়তা-মূলক, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

পক্ষপাতটা এই ব্যাপারেই শেষ হয় নি। বিল কেনা-কাটার ব্যাপারেও তা চোখে পড়ে। সে সম্বন্ধে দেশী রপ্তানিকারদের নালিশ এই যে, তাদের বিল কেনবার বেলাই ব্যাঙ্কের যত কড়াক্কড়। স্থানীয় বিদেশী কোন রপ্তানিকার হ'লে ব্যাঙ্ক চট্‌ পট্‌ তাদের বিলগুলি কিনে নেয়,—তা সে রপ্তানিকার ছোটই হোক, আর বড়ই

হোক। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের 'ক্লিন বিল' অর্থাৎ সাফাই বিল পর্য্যন্ত কিনে নিতে এরা কুণ্ঠা প্রকাশ করে না। কিন্তু দেশী রপ্তানিকার এলেই ব্যাঙ্ক দাবী করে বসবে যে, তাদের বিল দলিল-যোগ হওয়া চাই। শুধু তাই নয়, সেই বিলের পেছনে পরদেশী আমদানিকারের বা তার কোন ব্যাঙ্কের দায়-স্বীকার আছে কিনা, তাও সে দেখে নেবে। এমনি দায়-স্বীকার থাকলেই ব্যাঙ্ক দেশী রপ্তানিকারের বিল কিনতে রাজী হয়, নতুবা নয়। দায়-স্বীকার যদি বিদেশী কোন ব্যাঙ্কের না হয়ে অপর কারো হয়, তা হ'লে ব্যাঙ্ক বিল কিনতে রাজী নাও হ'তে পারে। বস্তুতঃ অনেক বিল ব্যাঙ্ক শুধু আদায়-চুক্তিতেই গ্রহণ করে থাকে। শুধু দেশী রপ্তানিকারের বেলায়ই নাকি ব্যাঙ্ক এমনি হুঁসিয়ার ভাবে ব্যবহার করে।

এ ত গেল রপ্তানিকারের সঙ্গে ব্যবহার। তারপর দেশী আমদানিকারের সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলি যে রকম ব্যবহার করে, সেটা আরও দুনিয়া ছাড়া ব্যাপার। মেয়াদী আমদানি-বিলের ওপর দায়-স্বীকার করেই যে তারা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে মাল খালাস করবার জন্য চালান-রসিদ বা অন্যান্য দলিল বের করে নেবে,—সে সুযোগ তারা সব সময়ই পায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশী আমদানিকারকে আদিষ্ট-পক্ষ করে যে সব বিল এদেশে আসে, সেগুলি হচ্ছে 'ডি, পি,' বা 'আদায়-সাপেক্ষ-দলিল-ছাড়' বিল। তাতে নগদ নগদ টাকা গুণে দিয়ে তবে মাল খালাস করে নেওয়া সম্ভব হয়। মাল খালাস করে নিয়ে সেটা বিক্রী সাবাড় করে যে আমদানিকার তার বিলের দাম দেবে, সে সুযোগ সে পায় না। কেবল যারা খুব বড় বড় আমদানিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তারাই এ রকম দায়-স্বীকারে দলিল ছাড়িয়ে নিতে পারে।

কিন্তু বিদেশী যে সব ফার্ম এ দেশে থেকে আমদানি ব্যবসা চালাচ্ছে, তাদের বেলায় এত সব বালাই নাই। ব্যাঙ্কের চোখে তারা সবাই সন্দেহ বা কুণ্ঠার বাইরে। শুধু কি তাই? দেশী আমদানিকার মাল চালান আনবার মতলব করে যদি কোন এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্করই কাছে আসে—তার কাছ থেকে পরদেশী রপ্তানিকারের বিলের ওপর দায়-স্বীকারের চুক্তি আদায় করতে, তা হ'লেও ব্যাঙ্ক আমদানিকারের দেনা-সম্পত্তির অবস্থা দেখে শুধু কমিশনের লোভেই তা অমনি দিয়ে দেয় না। তার আগেই নাকি ব্যাঙ্ক খতিয়ান খুলে দেখে যে, তার কাছেই প্রস্তাবকারীর কোন আমানত হিসেব আছে কিনা। এমনি ব্যবস্থার ফলে ব্যাপার নাকি এমনি দাঁড়িয়েছে যে, ব্যাঙ্কের কাছ থেকে শুধু তার আমানতকারী কোন দেশী আমদানিকারের পক্ষেই এখন এ রকম দায়-স্বীকারের চুক্তি আদায় করা সম্ভব, অপর কারো পক্ষে নয়। "যার খাই, তারে মারি" প্রবাদের এর চাইতেও জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত কিছু হতে পারে কি?

বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ও দেশের স্বার্থ-সংহতি

ভারতে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের কারবার কতকগুলি বিদেশী কোম্পানীর তাঁবে থাকবার জন্য দেশের কত খানি স্বার্থ-হানি হচ্ছে, এর পর তা বুঝতে আর মুস্কিল হবে না। অর্থাভাবে দেশের যথেষ্ট শিল্প-প্রসার সংঘটন করা সম্ভব হচ্ছে না, অথচ এই দেশবাসীরাই প্রায় ৭৫কোটি টাকা এই ব্যাঙ্কগুলির হাতে তুলে দিয়েছে; আর বিদেশী কোম্পানীগুলি তারই কেরামতিতে এমনি একটা কারবার ফেঁদে বসেছে, যাতে কোন দেশী ব্যাঙ্কেরই টুঁ মারবার সাধ্য নেই। অথচ দেশী ব্যাঙ্কগুলি যে এদের সঙ্গে লড়তে পারছে না, সে শুধু

তাদের টাকার জোর নেই বলেই। এই 'স্বখাতসলিলে' দেশবাসী আর কতকাল ডুবে রইবে ?

তারপর যে পরিমাণ টাকার লাভ এই সূত্রে একেবারে বেহাত হ'য়ে যাচ্ছে, ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে তা কি উপেক্ষনীয় হ'তে পারে ? শুধু তাই নয়। বিদেশী কোম্পানীর একচেটিয়া কারবারের দরুণ ভারতবর্ষের স্বার্থ-হানির জের এইখানেই শেষ হয় নি। এই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি ক্রমশঃ দেশের ভেতরই তাদের কারবারের গণ্ডী বিস্তার করবার দিকে মন দিয়েছে। শুধু আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের পোষণ করে বা তার সহয়তায় নিজেদের পুষ্টিসাধন করেই এরা নিরস্ত হয় নি। দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাঙ্কিংএর কারবারও যে দেশী কোম্পানীগুলি নির্ব্বিবাদে করতে পারবে, তারও পথ রাখা হয় নি। সেখানেও বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির শাখা অফিসের সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দিয়ে এদের আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে। এ পর্য্যন্ত দেশের ভেতরে নানা জায়গায় এই ব্যাঙ্কগুলি কত শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করেছে, নীচের তালিকা থেকেই সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়া যাবে :—*

চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এণ্ড চায়না—(এজেন্সী এবং শাখা-অফিস) আলোর ষ্টার (খেদা), অমৃতসহর, কানপুর, কলিকাতা, বম্বে, দিল্লী, করাচী, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন।

হংকং এণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কিং করপোরেশন—(এজেন্সী এবং শাখা-অফিস) বম্বে, কলিকাতা, রেঙ্গুন।

* 'থ্যাকার্স্ ডাইরেক্টরী' (১৯৩০)—হইতে সংগৃহীত।

লয়েডস্ ব্যাঙ্ক—(শাখা-অফিস) বম্বে, কলিকাতা, দিল্লী, করাচী, লাহোর, রাওলপিণ্ডি, সিমলা, শ্রীনগর (কাশ্মীর) (সব অফিস) মুরী (পঞ্জাব), গুলমার্গ (কাশ্মীর)।

মারক্যান্‌টাইল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া—(শাখা-অফিস) কলিকাতা, হাওড়া, বম্বে, দিল্লী, শিমলা, করাচী, রেঙ্গুন, মাদ্রাজ।

ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া—(শাখা অফিস) অমৃসহর, বম্বে, কলিকাতা, কানপুর, চাটগাঁ, কোচীন, দিল্লী, করাচী, লাহোর মাদ্রাজ, টিউটিকোরিণ।

ন্যাশানাল্ সিটি ব্যাঙ্ক অব্ নিউইয়র্ক—(শাখা অফিস) বম্বে, কলিকাতা, রেঙ্গুন।

নেদার ল্যাণ্ডস্ ট্রেডিং সোসাইটী—(শাখা অফিস) রেঙ্গুন, কলিকাতা, বম্বে।

পি এণ্ড ও ব্যাঙ্কিং করপোরেশন—(শাখা অফিস) কলিকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ, করাচী।

টমাস্ কুক্ এণ্ড সন্স—(শাখা অফিস) কলিকাতা, দিল্লী, রেঙ্গুন, মাদ্রাজ।

ইয়োকোহামা স্পিসি ব্যাঙ্ক—(শাখা অফিস) কলিকাতা, বম্বে।

ব্যাঙ্ক অব্ টাইওয়ান—(শাখা অফিস) কলিকাতা, বম্বে।

ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক—(শাখা অফিস) বম্বে, কলিকাতা, মাদ্রাজ, করাচী।

আমেরিকান একস্‌প্রেস কোম্পানী—(শাখা অফিস) কলিকাতা, বম্বে।

ওপরের তালিকা দেখলে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে ভারত-

বর্ষের ব্যবসা বা শিল্প-প্রধান কেন্দ্রীয় শহরগুলি কোনটাই বিদেশী একসচেঞ্জ ব্যাঙ্কের নজর এড়ায় নি। যদি ভারতীয় বন্দর কয়টাতেই এদের ব্যবসা-গণ্ডী সীমাবদ্ধ থাকত,—তা হ'লেও একথা অনুমান করা সম্ভব হ'ত যে, এই ব্যাঙ্কগুলি শুধু দেশের আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্যকে আশ্রয় করেই তাদের কারবার চালাচ্ছে। দেশের আভ্যন্তরীন কারবারের সঙ্গে আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্যের যোগাযোগ থাকতে পারে বটে, কিন্তু কোন বন্দরে পৌছাবার প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত মালের চলাচল বা বন্দর থেকে দেশের আভ্যন্তরীন কোন জায়গায় মাল পাঠানোর সহায়তা করা যে বহির্বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার নয়, এ রকম ধারণা করাই স্বাভাবিক। কাজেই যদি এ কথাও সত্য হয় যে, এক সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের শাখা অফিসগুলি কেবল বহির্বাণিজ্য-সংশ্লিষ্ট মাল চলাচলেরই পোষণ করে যাচ্ছে, তা হ'লেও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, এরা দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাঙ্কিং কারবারেও একটা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করেছে। এ প্রতিযোগিতার ফলে এমনও হ'তে পারে যে দু'এক জায়গায় ব্যাঙ্কের কর্জ্জের ওপর ওাদায়ী সুদের হার কমে গিয়েছে। কিন্তু এ সুবিধাটুকুর জন্য বিদেশী কোম্পানীর শাখা বিস্তার অব্যাহত থাকলে দেশী ব্যাঙ্কগুলি শেষ পর্য্যন্ত এমনি ধাক্কা খেতে পারে, যার বেগ হয় ত আর সামলানোই সম্ভব হবে না। এমনি অবস্থা দাঁড়ালে বর্ত্তমান সুবিধাটুকুর দাম হয় ত শেষে সুদে আসলে ফিরিয়ে দিতে হবে।

বিদেশী এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভারতের স্বার্থ-হানির এই শেষ কথা নয়। আরও দু'একটা ব্যাপার উল্লেখ না করলে এ প্রসঙ্গটা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। পুস্তকের সংজ্ঞা বিভাগে দলিল-যোগ বিলের সম্পর্কে বলা হ'য়েছে যে, এই ধরণের বিলএ চালান-রসিদ প্রভৃতির সঙ্গে জাহাজী-বীমাপলিসি বা চুক্তিপত্রও পেশ করতে হয়। আশ্চর্য্য এই

যে, এই বীমা-পলিসি নেবার ব্যাপারেও রপ্তানিকারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। বিদেশী এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি রপ্তানিকারের বিলের সঙ্গে কোন দেশী বীমা কোম্পানীর পলিসি নিতে গররাজী। এ কথাটা তারা স্পষ্ট করে না বল্লেও হাবভাবে বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দেয়, আর রপ্তানিকারেরাও তাদের এ সম্বন্ধে মেজাজটা বেশ বুঝে নিয়েছে। ব্যাপার বুঝে তারাও অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদেশী বীমা-কোম্পানীর পলিসি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ শুধু একচেটিয়া ব্যবসার জুলুম,—আর কিছু নয়। এ নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটির ফলে ইদানীং তারা দু'একটা দেশী কোম্পানীর পলিসি গ্রহণ করছে বটে, কিন্তু বিদেশী বীমা-কোম্পানীর তুলনায় দেশী-কোম্পানীর পলিসির আয়তন নিতান্তই তুচ্ছ। আজও বিদেশী-বীমা-কোম্পানীগুলি জাহাজী-বীমার পলিসি ছেড়ে যে পরিমাণ টাকা রোজগার করে নিচ্ছে,—সে শুধু আমাদের মত হতভাগ্য দেশেই চলতে পারে।

এ সম্পর্কে এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের একটা আপত্তি উঠতে পারে এই বলে যে, তারা ব্যবসায়িক পদ্ধতি অনুসারেই যে বীমা-কোম্পানীর পলিসি নেওয়া সব চেয়ে নিরাপদ মনে করে, তারই কাছ থেকে নেয়। এ আপত্তির মূলে কোন সার বস্তু নেই। ভারতীয় বীমা-কোম্পানীর শৈশব এখন উত্তরে গেছে বল্লেই চলে। একটু ধাক্কাতেই যে তারা বে-সামাল হ'য়ে পড়বে, এমন অবস্থা আর তাদের নেই। তা ছাড়া এ কথাও ঠিক যে, সাধারণ আর পাঁচ রকম ব্যবসায়ীক বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মত বীমা-কোম্পানী এমন ঠুনকো প্রতিষ্ঠান নয় যে, একটু ধাক্কা পেলেই তার টনক নড়বে। কাজেই বীমা-কোম্পানী নির্ব্বাচন সম্পর্কে আপদ নিরাপদের যে কথা ওঠে, সেটা নিতান্তই আজগুবি। *

* 'ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান্ চেম্বারস্ অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী'র তৃতীয় বার্ষিক বিবরণীতে (১৯৩০) প্রকাশিত মিঃ লালজী নারায়ণজীর প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

এ ত গেল বীমা-পলিসির নির্ব্বাচন ব্যাপার। এর পরের ব্যাপারটা আরও তাজ্জব মনে হবে। দেশের টাকায় দেশী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে লাভ আদায় করছে যে ব্যাঙ্ক, তাতে কোন ভারতীয়কেই দায়ীত্বপূর্ণ চাকরী দেওয়া হবে না। ম্যানেজারী, সব্-ম্যানেজারী বা শাখা অফিসের ম্যানেজারী ত দূরের কথা,—তিন চারশ' টাকা পানেওয়ালা নিম্নতর দেশী কর্ম্মচারীর সংখ্যাও খুব বেশী নয়। দেশী লোককে ভাল চাকরী দেবার কথা তুল্লেই ব্যাঙ্কের একটা আপত্তি হবে যে, "একসচেঞ্জ ব্যাঙ্কের" কাজ চালাতে হলে খুব তীক্ষ্ণধী সুদক্ষ কর্ম্মচারী চাই ; ভারতীয়দের সে রকম শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা কৈ? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া অনাবশ্যক। ভারতীয় কর্ম্মচারী প্রাদেশিক এমন কি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয় বিভাগের কাজ চালিয়ে দেবার জন্যই যদি উপযুক্ত বিবেচিত হ'তে পারে, তবে একটা একসচেঞ্জ ব্যাঙ্কের এমনি কি আকাশ ফাটা কারবার থাকতে পারে, যা দেশী কোন লোকের মগজে ঢুকতে পারে না? আর অভিজ্ঞতার কথাই যদি ওঠে, তবে ব্যাঙ্কগুলি তাদের অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদেরই বা দায়ীত্বপূর্ণ কাজ দিতে ভরসা পায় না কেন? তাদের কারো মগজেই কি ঘী নেই? এ প্রশ্নের একসচেঞ্জ ব্যাঙ্ক কি কৈফিয়ৎ দেবে?

তৃতীয় ভাগ

সমাধান

সমাধানের গতিপথ

পুস্তকের সমস্যাভাগে এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির একচেটিয়া ব্যবসার যে ছবি দেখানো হ'য়েছে, তারপর চট্‌ করেই একটা কথা মনে আসবে; সেটা হচ্ছে এই, "কেন, কোন আইন করে কি এদের জুলুম বন্ধ করে দেওয়া চলে না? কথাটা যেমন সহজ, তেমনি জটিল। এই এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কতকগুলি বড় বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে ইংরেজ জাতের স্বার্থ খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ আছে। কাজেই বে-পরোয়া ভাবে একটা প্রতিষেধক আইন করতে চাইলেই যে গভর্ণমেণ্ট তাতে সায় দিয়ে যাবে এমন কোনই সম্ভাবনা নেই। তবে সময় অনেক বদলে গেছে, সে কথাও ঠিক। এখন কোন একটা জুলুমের আসল চেহারাটা নির্ভুল ভাবে দেখিয়ে দিতে পারলে একটা কিছু ব্যবস্থা হ'বার সম্ভাবনা থাকে; অন্ততঃ চোখ ঠেড়েই সেরে যাবার উপায় নেই। কিন্তু তবু গলাবাজি করে এর জন্য কোন ওষুধ বাত্‌লানো চলবে না;—এর জন্য চাই বহুৎ ঠাণ্ডা মাথা, আর বহুৎ গরম গরম আট ঘাট বাঁধা যুক্তি।

আর একটা কারণে এ সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা হ'বার আশা করা যাচ্ছে। কিছু দিন হ'ল ভারত গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক-তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেছেন,—এদের মাথায় রয়েছে একটা পৃথক কেন্দ্রীয় কমিটি। প্রাদেশিক কমিটিগুলির কাজ হ'ল মুখ্যতঃ দেশের ব্যাঙ্ক-প্রসার সম্বন্ধে অবস্থা নির্ণয় করা, আর কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ হ'ল এই অবস্থার সঠিক পরিচয় পেয়ে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেওয়া। এই ব্যাঙ্ক-প্রসারের বর্তমান অবস্থা নির্ণয় করবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি কতকগুলি তদন্তের ভার প্রাদেশিক কমিটির হাতে না দিয়ে নিজের হাতেই রেখেছেন; এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের অবস্থা নির্ণয় করা ও তাদের ক্রিয়া-পদ্ধতির বিশ্লেষণ

করা তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে। কাজেই এ সময় এই বিষয় নিয়ে আমাদের খুব নাড়াচাড়া করবার দরকার হ'য়ে পড়েছে। ব্যাঙ্ক-তদন্ত কমিটি একটা কিছু করবেন, এ রকম আশা করা যেতে পারে।

কিন্তু এই কমিটিকেও বেশ ভাল করে বোঝানো দরকার হ'য়ে পড়েছে যে, কোন রকম নিয়ামক আইন ছাড়া এ সমস্যা থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় নেই। ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা, বা তাদের 'ধর্ম্মের কাহিনী' শুনিয়ে কোন ফল হবে না। চাই কিছু চড়া দাওয়াই। সেজন্য তদন্ত-কমিটির বিশেষ ইতস্ততঃ করবারও কারণ নেই। বর্ত্তমান জগতে অনেক দেশই এ রকম চড়া দাওয়াই খেয়ে হজম করে ফেলেছে। তারা সবাই ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বেশী গায়ের জোর রাখে; তবু তারা এ দাওয়াই ব্যবহার করতে কসুর করে নি। আর ভারতবর্ষের মত দুর্ব্বল দেশ,—যাকে উঠতে বসতে আত্মরক্ষা করে চলতে হয়, তার পক্ষে যে এই চড়া দাওয়াইটাই ধন্বন্তরি হবে, তাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু তবু সেটা বরদাস্ত হবে কি না, বা হ'লেও কতটা অবধি হবে তা একটু যাচাই করে নেওয়া দরকার।

এই চড়া দাওয়াইটার ব্যাকরণ-শুদ্ধ পরিচয় হ'ল 'বিদেশী ব্যাঙ্ক-নিয়ামক আইন',—যার বিন্দুমাত্র এ দেশে এখনও কায়েম করা হয় নি। তাই যদি এ দেশের বাঁচোয়ার একমাত্র পথ হয়, তবে অন্য পাঁচটা দেশের ব্যবস্থাগুলি আমাদের একটু বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। এর দুটো কারণ আছে। প্রথম, স্বল্পনভিজ্ঞ দেশের পক্ষে নূতন পথে চলতে হ'লেই পাঁচটা দৃষ্টান্ত যাচাই করে নেওয়া ভাল। তাতে পথের গতিটা কোন দিকে হবে তাও নির্দ্দেশ করা যেতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে ভুল-ভ্রান্তি থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে। এই হ'ল প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণটার গুরুত্বও এর চাইতে কম নয়। সেটা হ'ল এই যে,

পাচটা বড় বড় দেশের দৃষ্টান্ত দেখাতে পারলে এ রকম ব্যবস্থায় জোর বাধে বেশী। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি আপত্তি করতে চাইলেও বেশী জুত পায় না, আর গভর্ণমেণ্টকেও বলা চলে যে, দেশের হিতই যখন তাঁরা কামনা করছেন তখন দেশের কল্যাণের জন্যই আর পাচটা দেশ যা ব্যবস্থা করেছে, তারাও তাই করুন,—তাতে সৃষ্টি-ছাড়া কোন কাণ্ড করা হবে না।

মহাজনো যেন গতঃ—

এবার তা হ'লে আলাদা করে কয়েকটা দেশের বিদেশী ব্যাঙ্ক নিয়ামক আইন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে কোন বিদেশী ব্যাঙ্ককেই দেশবাসীর কাছ থেকে আমানতি হিসেবে টাকা নিতে দেওয়া হয় না। তুলনা-মূলক ভাবে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের পার্থক্যটা খুব বেশী করে চোখে পড়ে। কিন্তু এতেই যুক্তরাষ্ট্র ক্ষান্ত হয় নি। সেখানে বিদেশী ব্যাঙ্কের স্থানীয় সম্পত্তির ধার্য্য মূল্যের ওপর একটা ট্যাক্স আদায় করাও দস্তুর। তা ছাড়া বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি সেখানকার কারবারে যে লাভ রোজগার করে, তার ওপরও একটা ট্যাক্স আদায় করা হয়।

ফরাসী

ফরাসীর আইনে আরও কড়াকড় চোখে পড়ে। সেখানে বিদেশী ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা র'য়েছে, তাতে তাদের কারবার চালাবার জন্য ফরাসী যৌথকোম্পানী-নিয়ামক আইন অনুসারে একটা পৃথক প্রতিষ্ঠান কায়েম করে নেওয়াই তারা প্রশস্ত মনে করে। আইনের চোখে

সেটাও একটা ফরাসী কোম্পানীরই সামিল বলে গণ্য হয়। বিদেশী ব্যাঙ্কের শাখা অফিসগুলি যে আইনের বশবর্ত্তী হ'য়েই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, ফরাসী আইন অনুসারে যদি কখনও তাদের কারবার বন্ধ করে দেবার মত অবস্থা হয়ে পড়ে, তবে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট নিজেই তার কারবার বন্ধ করে দিতে পারে। তা'ছাড়া এমনি সব ব্যাঙ্কের জন্য পৃথক কতকগুলি ব্যবস্থা আছে। এই ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলিতে যে পরিমাণ বিদেশী মূলধন খাটে, তার ওপর একটা ট্যাক্স আদায় করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের মত এখানেও এদের স্থানীয় সম্পত্তির ধার্য্যমূল্য ও স্থানীয় কারবারের লাভের ওপর ট্যাক্স দেবার নিয়ম আছে। এর পরও একটা ব্যবস্থা আছে যে, অন্য কোন দেশে ফরাসী ব্যাঙ্কের সঙ্গে যে রকম আচরণ করা হবে, সেখানকার কোন ব্যাঙ্ক ফরাসীতে পৃথক কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করলে ফরাসী-গভর্ণমেণ্ট তাদের সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করবে।

ইতালি

ইতালির ব্যবস্থায়ও যথেষ্ট শিক্ষনীয় ব্যাপার আছে। এ দেশে কোন বিদেশী ব্যাঙ্কই গভর্ণমেণ্টের সনন্দ না নিয়ে অফিস প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট অনুমতি দেবে কি না, বা কি সর্ত্তে অনুমতি দেবে,—এসব যে দেশের ব্যাঙ্ক ইতালিতে শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, সে দেশের গভর্ণমেণ্ট সেখানকার ইতালিয়ান ব্যাঙ্কের শাখার ওপর যে ধরণের আইন জারী করবে, তার ওপর নির্ভর করে। ফরাসীর মত এখানেও তাদের স্থানীয় আইন অনুসারে পৃথক কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে কারবার চালানো সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হয়। তা' ছাড়া গভর্ণমেণ্টের কাছে তারা নির্দ্ধারিত পরিমাণ টাকা গচ্ছিত রাখতে বাধ্য থাকে।

জার্ম্মাণী

ইতালির মত জার্ম্মাণীর ব্যবস্থায় এত বৈচিত্র্য না থাকলেও সেখানে গভর্ণমেণ্ট নিয়ামক আইন করতে কসুর করে নি। সরকারের অনুমতি না নিয়ে কোন পরদেশী ব্যাঙ্ক জার্ম্মাণীতে ভূ-সম্পত্তির মালিক হ'তে পারে না। তা' ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকের কাছ থেকে আমানতে টাকা নেওয়াও তাদের পক্ষে আইন বিরুদ্ধ ব্যাপার।

জাপান

এসিয়াবাসী জাপানীদেরও চোখ খুলে গেছে। তারাও এ বিষয়ে একটা আইন করবার মামলত বুঝে নিয়েছে। তাই আজ সেখানকার অর্থ সচিবের পরওয়ানা পেলেই কোন বিদেশী ব্যাঙ্ক সেখানে শাখা-অফিস প্রতিষ্ঠা করতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক বিদেশী ব্যাঙ্ককে তার শাখা-অফিসের জন্য জাপানী গভর্ণমেণ্টের কাছে ১ লক্ষ ইয়েন মূল্যের সিকিউরিটি জমা রাখতে হয়। প্রতিষেধক আইন দিয়ে এমনি ব্যবস্থা করা হয়নি বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে কোন বিদেশী ব্যাঙ্কের পক্ষে জাপানীদের কাছ থেকে আমানতি টাকা নেবার রেওয়াজও সেখানে নেই। *

—সঃ পন্থা

বিভিন্ন দেশের এই ব্যবস্থাগুলি দেখে আর সংশয় করবার কোনই কারণ থাকবে না যে, ভারতবর্ষেও এমনি একটা বিদেশী-

* মেসার্স পার্কার এণ্ড উইলিস প্রণীত "ফরএন ব্যাঙ্কিং সিষ্টেমস্" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ব্যাঙ্ক নিয়ামক আইন করবার দরকার আছে। এ দেশে অবাধ ব্যবসার ক্ষেত্র পেয়ে ব্যাঙ্কগুলি যে রকম জুলুম করতে আরম্ভ করেছে, তা বন্ধ করে দেওয়াই হবে এই আইনের মতলব। তার জন্য প্রথমেই এমনি ব্যবস্থা করতে হবে যে, ভবিষ্যতে কোন বিদেশী ব্যাঙ্কই ভারত গভর্ণমেণ্টের সনদ না নিয়ে এদেশে তাদের কারবার চালাতে পারবে না। আর এই সনদ-পত্র দেবার মধ্যেই এমনি সব চুক্তি থাকবে, যাতে ব্যাঙ্কগুলি আর যথেচ্ছ ব্যবহার করবার সুযোগ পাবে না। তাদের হিসেব-পত্রের মধ্যে যাতে আর হেঁয়ালী কিছু না থাকে, সে জন্য তাদের মাসিক বা ত্রৈমাসিক একটা বিবরণী পেশ করাতে বাধ্য করা হবে। বিবরণীতে এদের স্থানীয় শাখা-অফিসের মূলধনের পরিমাণ, গৃহীত আমানত, গোটা বছরের লাভালাভ সব কিছুরই বিস্তারিত খবর থাকবে।

সনদ-চুক্তির বিভিন্ন দফা

এই গেল সনদ-চুক্তির প্রথম দফা। তারপর স্থানীয় আমানতকারীদের স্বার্থের দিকে চেয়ে আরও কতকগুলি ব্যবস্থা করবার দরকার হবে। বর্তমানে ভারতীয় আমানতকারীরা বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির চমকপ্রদ মূলধনের জোর ও কারবারের আয়তন দেখে একেবারে নিঃসংশয়ে এদের কাছে টাকা গচ্ছিত রেখেছে। তাদের এই ভরসার গোড়ায় কোন খুঁটো আছে কিনা, তা পরখ করে দেখবারও কোন দরকার তারা মনে করছে না। মনে তারা করুন, চাই নাই করুন, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তাদের এই পরম নির্ভরশীল আস্থার শক্ত কোন বনিয়াদ নেই।

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির ভারতীয় শাখা তাদের হেড অফিসের

শাখা-অফিস ছাড়া আর কিছু নয়। সর্ব্বতোভাবে তারা হেড্ অফিসের কর্তৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠান। খুসী হ'লেই হেড্অফিস তার ভারতীয় কারবার গুটিয়ে নিতে পারে। তা হ'লে ভারতীয় আমানতকারীদের গচ্ছিত টাকার দাবী পেশ করতে হবে এই হেড্অফিসের কাছেই। স্থানীয় শাখা-অফিসের হেড্অফিসকে বাদ দিয়ে এমন কিছু স্বাতন্ত্র্য নেই, যাতে ব্যাঙ্কের ভারতীয় সম্পত্তির ওপর তারা নিজ নিজ দাবী সন্নিবদ্ধ করতে পারে। সে সম্পত্তির ওপর ভারতীয় আমানতকারীর যে দাবীর জোর, তা ব্যাঙ্কের বিদেশী কোন আমানতকারীর দাবীর চাইতে এক তিল বেশী নয়। স্থান নির্ব্বিশেষে ব্যাঙ্কের সব আমানতকারীই তখন এক পর্য্যায় এসে দাঁড়াবে। সমস্ত আমানতকারী হবে ব্যাঙ্কের পাওনাদার,—দেনদার হ'ল ব্যাঙ্ক। সমস্ত শাখা-অফিস নিয়ে সে একটা মাত্র প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের জাতীয়তা বিচার করা হবে যেখানে তার হেড অফিস রয়েছে, সেই দেশ অনুসারে। সেখানকার আইন অনুসারেই ব্যাঙ্কের দেনা-পাওনার দাবী চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। এই যদি সত্যিকার ব্যাপার হয়, তবে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির ভারতীয় আমানতকারীদের আস্থার গোড়ায় খুব শক্ত বনিয়াদ আছে, এ কথা বলা চলে কি? এরা এ দেশে যে পরিমাণ টাকা আমানত নিচ্ছে, এ দেশে তার সম-পরিমাণ মূল্যের সম্পত্তি এদের নাও থাকতে পারে। আর থাকলেই বা কি? তার ওপরও ত ভারতীয় আমানতকারীর প্রথম দাবী-সূচক কোন ক্ষমতা নেই। কোন কারণে যদি একটা বিদেশী ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে যায়, তা হ'লে তার ভারতীয় সম্পত্তি আটক দেবার কোন উপায় থাকবে না। তার মূল্য প্রথম জমা হবে হেড্অফিসের 'লিকুইডেটার' বা আইনানুমোদিত ব্যবসা-নিবৃত্তি-সহায়ক কর্ম্মচারীর হাতে,—তারপর

দেশ নির্ব্বিশেষে সব আমানতকারীদের মধ্যে তা বণ্টন করে দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

ঠিক এজন্যই পূর্ব্বকথিত সনদ-পত্রের মধ্যে ভারতীয় আমানতকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ করবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা করবার দরকার হবে। যদি এ সব ব্যাঙ্ক এ দেশে আমানত হিসেবে টাকা নিতে থাকে তা হ'লে গৃহীত আমানতের সবটা না হোক, অন্ততঃ শতকরা পঁচাত্তর ভাগই তাদের এ দেশেই লগ্নী করাতে বাধ্য করাতে হবে। আর তারই সঙ্গে এমনি একটা পৃথক চুক্তি থাকবে যে, কখনো ব্যবসা নিবৃত্তি করবার দরকার হ'লে ব্যাঙ্কের স্থানীয় সম্পত্তির ওপর ভারতীয় আমানতকারীদেরই প্রথম দাবী বহাল থাকবে। এই হ'ল সনদ-চুক্তির দ্বিতীয় দফা।

সনদ-চুক্তির তৃতীয় দফা হবে দেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নিবারণ করবার জন্য। গ্রন্থের সমস্যা বিভাগে একটা তালিকা দিয়ে দেখানো হ'য়েছে যে, বিদেশী একসচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি বর্ত্তমানে ভারতীয় আভ্যন্তরীন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়েও ক্রমশঃ হস্তক্ষেপ করছে। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দেশী ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির আভ্যন্তরীন শাখা অর্থাৎ বন্দর সংস্থিত শাখা বাদে অন্যান্য শাখার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছে না, এমনি সব নালিশও তারা বিভিন্ন কমিটি কমিশনের কাছে পেশ করেছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে জাতীয় উদ্যমের তরফ থেকে এটা একটা বিশেষ ভাববার কথা। সে জন্য সনদ-চুক্তিতে এমন কোন নিষেধ-মূলক ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এর পর থেকে বন্দর বাদ দিয়ে আর কোন সহরেই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি তাদের শাখা বিস্তার করতে না পারে।

সনদ-চুক্তির চতুর্থ দফার উদ্দেশ্য হবে একসচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির

পক্ষপাতমূলক ব্যবহার নিবারণ করা। এ সম্বন্ধে সমস্যা বিভাগেই বিস্তারিত বলা হ'য়েছে। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি এর পর থেকে সনদ নেবার সময়ই এমনি চুক্তিবদ্ধ হবে যে, তারা খদ্দেরদের সঙ্গে কোন রকম পক্ষপাতমূলক বা অন্যায় প্রভাব সূচক ব্যবহার করবে না। তা হ'লে এদের বিরুদ্ধে দেশী ব্যবসায়ীদের নালিশ করবার আর কোনই কারণ থাকবে না। এজন্য সনদ-পত্রে স্পষ্টই উল্লেখ করে দিতে হবে যে, ব্যাঙ্ক দেশী ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে অভিমত দেওয়া বা তাদের কাছ থেকে দেশী বীমা কোম্পানীর পলিসি নেওয়া, ইত্যাদি ব্যাপারে কোন রকম পক্ষপাতমূলক বা বাধ্যতামূলক ব্যবহার করবে না। ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধেও একটা ব্যবস্থা এই চতুর্থ দফার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সনদ দেবার কর্ত্তা হবে কে

(ক) ভারতীয় ব্যাঙ্ক নিয়ামক সমিতি

এখন কথা হ'ল যে এই সনদ-পত্র দেওয়া বা তার চুক্তি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রন করবার ক্ষমতা দেওয়া হবে কাকে? এই সমস্যা নিয়ে যারা মাথা ঘামিয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বি, টি ঠাকুর মহাশয়ের মত বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। * ঠাকুরমহাশয় বিদেশী-ব্যাঙ্কগুলির জন্য সনদ নেওয়ার ব্যাপারকে বাধ্যতামূলক করে দেবার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, এই সনদ মঞ্জুর করবার কর্ত্তৃত্ব একটা পৃথক নব-গঠিত ব্যাঙ্কিং কৌন্সিলের ওপর ন্যস্ত হওয়া উচিৎ।

* মিঃ বি, টি, ঠাকুর প্রণীত "অরগ্যানিজেশন অব্ ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কিং" নামক গ্রন্থের (১৯২৯) দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কিং কৌন্সিলের হাতে ঠাকুর মহাশয় দেশী এবং বিদেশী ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় দায়ীত্ব ন্যস্ত করতে চান। এই ব্যাঙ্কিং কৌন্সিলের গঠন ও ক্রিয়া-পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করেছেন, এখানে তার একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভারতগভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান আয়-ব্যয় বিভাগের তাঁবে একটা নূতন দপ্তর খোলা হবে। দপ্তরটা যে কর্ম্মচারীর চার্জ্জে থাকবে, তিনি আয়-ব্যয় বিভাগের 'ফাইন্যান্স সেক্রেটারী' বা কোষ-সম্পাদকের সমপদস্থ কর্ম্মচারী হবেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই নূতন কর্ম্মচারীর কার্যাপরম্পরায় কোন সম্পর্ক থাকবে না। নূতন কর্ম্মচারীর পদবী 'কন্‌ট্রোলার অব ব্যাঙ্কস' অর্থাৎ ব্যাঙ্ক নিয়ন্তা বা এমনি একটা কিছু হবে। রাজস্ব-সচিবের সঙ্গেই এই ব্যাঙ্ক-নিয়ন্তার একটা সোজাসুজি সম্পর্ক কায়েম করা হবে। প্রস্তাবিত 'ব্যাঙ্কিং কৌন্সিলের' বা ব্যাঙ্ক নিয়ামক সমিতির উপদেশ ও সম্মতি নিয়ে বড়লাট বাহাদুর এই ব্যাঙ্ক নিয়ন্তার নিয়োগ ব্যবস্থা করবেন। ব্যাঙ্ক-নিয়ন্তার অধীনে দু'জন ডেপুটি কন্‌ট্রোলার থাকবে, এদের অধীনে আবার প্রত্যেক প্রদেশের জন্য দুজন করে 'ব্যাঙ্ক এগ্‌জামিনার' বা ব্যাঙ্ক পরীক্ষক থাকবে। এদের সবারই নিয়োগ করবার কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত হবে ব্যাঙ্ক নিয়ামক সমিতির হাতে। একেবারে নীচুর ধাপে থাকবে সব সহকারী ব্যাঙ্ক-পরীক্ষক। পূর্ব্বকথিক ব্যাঙ্ক-পরীক্ষকদের নিম্নতন কর্ম্মচারী হিসেবে এদের নিয়োগ ব্যবস্থা করা হবে। সদা সর্ব্বদা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হিসেব পত্র দেখা শোনা এই সহকারী ব্যাঙ্ক পরীক্ষকরাই করে যাবে। সেজন্য প্রত্যেক প্রদেশে ক'জন সহকারী পরীক্ষক নিযুক্ত হবে, তা নির্ণয় করতে হবে সেই প্রদেশস্থিত ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা অনুসারে। ভারতবর্ষে ভবিষ্যৎ ব্যাঙ্ক-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ঠাকুর মহাশয় যে

প্রস্তাব করেছেন, তার কাঠামোর মোদ্দা চেহারাটা হ'ল এই। এ সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক কথা বলেছেন। এখানে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার দরকার নেই। তবে বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত "ব্যাঙ্ক-নিয়ামক সমিতি" সম্বন্ধেই আরও দু'একটা কথা জেনে রাখা ভাল। ঠাকুর মহাশয়ের মতে এই সমিতির ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়াই হবে সব চেয়ে বড় কাজ,—তবে কোন কোন বিষয়ে কন্‌ট্রোলার বা ব্যাঙ্ক-নিয়ন্ত্রার ওপরও এর শাসন ক্ষমতা থাকবে। সমিতির গঠন সম্বন্ধে ইনি যে প্রস্তাব করেছেন তার মর্ম্ম নিম্নরূপঃ— সমিতির মেম্বারদের মোট সংখ্যা হ'বে বার। ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিব, কন্‌ট্রোলার অব্ ব্যাঙ্কস্ ও প্রস্তাবিত ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার এই সমিতির স্থায়ী মেম্বর নির্ব্বাচিত হবেন। সমিতির তিনজন মেম্বর নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা দেওয়া হবে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদকে ;—তার মধ্যে দু'জন মেম্বর এমনি লোক হওয়া চাই, যাদের কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। অন্যান্য মেম্বর নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও একটু বিস্তারিত জানা দরকার। ঠাকুরমহাশয় ভারতীয় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটা ব্যাপক ভাবে আইন কায়েম করবার প্রস্তাব করেছেন। এই আইন অনুসারে যে সব ব্যাঙ্ক গভর্ণমেণ্টের রেজেষ্টারীতে নিজেদের নাম তালিকা-ভুক্ত করে নেবে, তারা সবাই মিলে ব্যাঙ্ক-নিয়ামক সমিতির তিন জন মেম্বার নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা লাভ করবে। কোন অসাধারণ ব্যাঙ্কিং-আইন করে যদি কোন বিশেষ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করবার দরকার হয়, তা হ'লে এরাও সমিতির একজন মেম্বর নির্ব্বাচন করতে পারবে। বাকী দু'জন মেম্বর ভারত-গভর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্ব্বাচিত হবে। গভর্ণমেণ্টের হাতে এই দু'জন মেম্বরের নির্ব্বাচন ক্ষমতা ন্যস্ত করা হবে কেবল কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির স্বার্থের মধ্যে একটা সাম্য

রক্ষা করবার জন্য। রাজস্ব-সচিব হবেন এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট আর সেক্রেটারী হবেন 'কন্‌ট্রোলার অব্‌ ব্যাঙ্কস' বা পূর্ব্বকথিত ব্যাঙ্ক-নিয়ন্ত্রা।

এ হেন ব্যাঙ্ক-নিয়ামক সমিতির ওপর ঠাকুর মহাশয় সনদ দেবার ক্ষমতা ন্যস্ত করতে চেয়েছেন।

(খ) রাজস্ব-সচিব

কারো কারো আবার মত হচ্ছে এই যে, জাপান প্রভৃতি দেশের মত এই সনদ দেবার ক্ষমতাটা ভারতবর্ষেও কেবল রাজস্ব-সচিবের হাতে ছেড়ে দিলেই চলতে পারে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে শাসন-ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে ব্যাপারটা বড়লাটের শাসন পরিষদের কোন সভ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া সমিচীন হ'তে পারে না, অন্ততঃ যতদিন স্বরাজ-শাসনের মাত্রা যথেষ্ট না বেড়ে যাচ্ছে। এই সনদ দেবার ব্যবস্থার মধ্যেই যে ভারতবর্ষের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের একটা স্বার্থ-সংঘর্ষের ব্যাপার নিহিত রয়েছে, তা বেশ ভাল করে সমঝে নেওয়া দরকার। কাজেই যতদিন এ দেশে এমন শাসন-সংস্কার না প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যাতে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সভ্যের সবাই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের তাঁবে এসে পড়বে, তত দিন এই স্বার্থ-সংঘাতের নিয়ন্ত্রণ কোনমতেই একজন মাত্র কর্ম্মচারীর হাতে ছেড়ে দেওয়া চলতে পারে না। ঠাকুর মহাশয় যে পথটা বাতলে দিয়েছেন, সেটাকে একটা রফা-বন্দোবস্ত বলা যেতে পারে। গভর্ণমেণ্টের প্রভাব বজায় রাখলেও তিনি সমিতির গঠন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অনুমোদন করেছেন, তাতে জাতীয় স্বার্থ-হানির খুব আশঙ্কা থাকবে না, কারণ সমিতির তিনজন করে ছয় জন সদস্যই নির্ব্বাচন করবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও সমুদয় দেশী ব্যাঙ্ক। দেশের স্বার্থ-রক্ষার জন্য যা কিছু বলা দরকার, তা' এরাই করতে পারবে।

(গ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

তবু কাজের সুবিধার জন্যই এই সনদ দেবার ব্যাপারটা একটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ন্যস্ত রাখাই সব চেয়ে ভাল মনে হবে। ঠাকুর মহাশয় যে ব্যাঙ্ক-নিয়ামক সমিতির প্রস্তাব করেছেন,—তার ওপর শুধু বিদেশী ব্যাঙ্ক নয়, দেশের যাবতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ভার ন্যস্ত হবে, এই অভিপ্রায়ই তিনি প্রকাশ করেছেন। এমতাবস্থায় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণের ভার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে তুলে দিলে ব্যাপারটা অনেক ভাবেই সহজে হ'য়ে আসতে পারে। বর্ত্তমানে এ দেশে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নেই। 'ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' যে একটা খাটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নয়, এ কথাটা বুঝে রাখা দরকার। এই ব্যাঙ্ক কোন কোন বিষয়ে একটা গভর্ণমেণ্ট পোষিত ব্যাঙ্ক বটে,—কিন্তু খাটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কতকগুলি লক্ষণ এর মধ্যে নেই। বর্ত্তমান ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে একটা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ থাকা দরকার। প্রথম লক্ষণ হ'ল এই যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মাত্রই গভর্ণমেণ্টের খাজাঞ্চির কাজ করবে; গভর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত লেনদেন সব এই ব্যাঙ্কের মারফৎই চলবে। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যাঙ্কের হাতে আইনের জোরেই হো'ক, বা প্রথাগত ব্যাপার হিসেবেই হো'ক, গোটা দেশের ব্যাঙ্ক-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে। গোটা দেশের টাকা কড়ির বাজারের ওপর এই ব্যাঙ্কের অসাধারণ প্রভাব থাকবে। ব্যাঙ্ক যে ভাবে এই ক্ষমতা বা প্রভাব ব্যবহার করবে, তার মূলে থাকবে একটা তীক্ষ্ণ দেশ-হিতৈষনা। সে জন্য কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই একটা সাধারণ ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের মত পরিচালিত হ'তে পারে না। অংশীদারকে মোটা 'ডিভিডেণ্ড' দেবার জন্য নিতান্ত স্বার্থপরের মত লাভ অর্জ্জন

করাই তার চরম উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ককে সুব্যবস্থিত রাখা, আপদ বিপদে তাদের সাহায্য করা,—এ সবই আজ-কাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম কর্ত্তব্য বলে নির্দ্ধারিত হ'য়েছে। এ সমস্ত কাজ করবার জন্যই আর একটা দায়ীত্ব তার হাতে দেওয়া হ'য়ে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে আজকাল সব দেশেই নোট বের করবার একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া দস্তুর হ'য়ে পড়েছে। এ ক্ষমতাটা যার নেই তাকে ঠিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আখ্যা দেওয়া চলে না। বস্তুতঃ এই ক্ষমতাটাই হচ্ছে ব্যাঙ্কের তৃতীয় বা প্রধান লক্ষণ। বর্ত্তমানে ভারতীয় ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ককে এই ক্ষমতাটা দেওয়া হয় নি। শুধু এ জন্যই নয়, আরও কতকগুলি কারণে এই ব্যাঙ্ককে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বল্লে ভুল হবে। এ দেশে এমন কোন ব্যবস্থা নেই বা এমন কোন প্রথা গড়ে ওঠে নি, যাতে সমস্ত ব্যাঙ্ক-নিয়ন্ত্রণের ভার এই ব্যাঙ্কের হাতে কেন্দ্রীভূত হ'তে পারে। তা'ছাড়া এই ব্যাঙ্কের মারফৎ ভারত-গভর্ণমেণ্টের অধিকাংশ লেনদেন সম্পাদিত হ'লেও, একথা ঠিক যে, ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক একটা নিছক অংশীদারের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান,—অর্থাৎ সাধারণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মত লাভ অর্জ্জন করাই এর চরম উদ্দেশ্য। জাতীয় আর্থিক উন্নতি এর মূল মন্ত্র নয়।

এই সব কারণে অনেক দিন থেকেই এ দেশে একটা আন্দোলন চলে আসছে যে, অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও একটা খাঁটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার মধ্যে পূর্ব্বে যে তিনটা লক্ষণের কথা বলা হ'য়েছে, তার সবগুলিই বর্ত্তমান থাকবে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য যে কমিশন নিয়োগ করেছলি সেই কমিশন এই ধরণের একটা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেখিয়ে গিয়েছেন। তখন থেকেই এ দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জোর বেঁধেছে বেশী। এর জন্য আয়োজনও চলছিল বেশ। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকেই ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য একটা খসড়া বিল পেশ করা হ'য়েছিল। বিলটা নানা গোলমালে শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক-আইনে কায়েম হ'তে পারে নি,—সে সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত আলোচনা না করলেও চলবে। কিন্তু তখন বিলটা পাশ না হ'লেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প এখনও মরে যায় নি। দেশের আবহাওয়া একটু বদলালেই একটু রকম-ফের হ'লেও বিলটা আবার পুনর্জীবন লাভ করবে, সন্দেহ নেই। সে বিষয়ে ভারতবাসী নাছোড়বান্দা,—গভর্ণমেণ্টেরও ব্যাপারটাকে একেবারে ধামা-চাপা দেবার মতলব নেই।

সে যাই হোক, সবগুলি লক্ষণ নিয়েই যখন ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হবে, তখন যে এ দেশের সমস্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ভার এরই হাতে ন্যস্ত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। এই নিয়ন্ত্রণের পরিচয়টা জানা ভাল! সাধারণতঃ যে সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে, সেখানকার বিবিধ ব্যাঙ্ক, আইনের বাধ্যতা বশতঃই হো'ক, আর প্রথা মেনেই হো'ক, তাদের রিজার্ভ ফণ্ডের অংশ পরিমাণ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে রাখতে অভ্যস্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় এর জন্য বাধ্যতা-মূলক ব্যবস্থা আছে ;—ইংলণ্ডে এ রকম কোন আইন না থাকলেও, একটা বিশেষ প্রথার জোরে তার অভাব পূরণ করা হ'য়েছে। সমগ্র ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা এমনি করে কেন্দ্রীভূত হবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাদের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সম্বন্ধের ফলে আমানতকারী ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে কতকগুলি কাজে সুবিধা পায়। তারা যে ব্যবসায়িক বিল বা হুণ্ডীর ওপর

টাকা লগ্নী করে, নগদ টাকার টান পড়লেই সেই বিলগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে টাকা সংগ্রহ করে নেওয়া চলতে পারে। সাধারণ ব্যাঙ্কের পক্ষে এটা কম সুবিধার কথা নয়। নগদ টাকার ঘাটতি পড়লে একটা ব্যাঙ্ক ফেলও পড়তে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সে বিষয়ে খুব মুস্কিল হ'বার কথা নয়। তাকে নোট বের করবার ক্ষমতা দেবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই। তা ছাড়া এই ব্যাঙ্কের কাছে গভর্ণমেণ্টের তহবিল থাকলে নগদ টাকা ঘাটতি পড়বার খুব আশঙ্কাও থাকতে পারে না। কোন একটা ব্যাঙ্ক এই কারণই বিপদে পড়লে তার দায়োদ্ধার করে দেবার মত ক্ষমতা একটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের থাকে। এই দায়োদ্ধারের ব্যাপারে বেশ একটু তাৎপর্য্য আছে। ব্যাঙ্কের ফেল পড়া একটা ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ। একটা ব্যাঙ্ক কাৎ হলেই সমস্ত ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা এস্ত হ'য়ে ওঠে। অনেকেই মনে করে, কি জানি, শেষে তাদেরও ব্যাঙ্ক যদি ফেল পড়ে। তাই তারা আগে থেকে যার যার টাকা তুলে নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'বার জন্য ব্যস্ত হয়। কিন্তু সবাই এ রকম ব্যস্ত হ'লেই ব্যাঙ্কের পক্ষে তাল সামলানো অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। সে যে আমানতকারীর কাছ থেকে টাকা নেয়, তা ত আর সিন্দুকে জমা করে রাখা হয় না। আমানতি টাকার একটা শতাংশ পরিমাণ মজুদ রেখে বাকী সবটাই বিবিধ শিল্প ব্যবসায়ে লগ্নী করাই হ'ল তার রেওয়াজ। এই লগ্নী টাকাটা চট্ করে আদায় করা সম্ভব নয়, অথচ আমানতকারীর টাকা দিতেও সে বাধ্য। এমনি যখন ব্যাপার, তখন ব্যবসা গুটোনো ছাড়া তার আর অন্য উপায় থাকে না। এমনি অবস্থায়ই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দরকার ; না হ'লে গোটাদেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার একটা বিপর্য্যয় হ'য়ে যেতে পারে।

অথচ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটা নিছক সুদখোর প্রতিষ্ঠান না হ'লেও ব্যাঙ্ক ত বটে। এটা ত একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। দেশের ব্যাঙ্কের সহায়তা করা এর দস্তুর বটে, কিন্তু তাদের অসময়ে এ যে বিলের ওপর ধার দিয়ে, বা অন্য যে জামিন রেখেই হো'ক, অর্থ সাহায্য করবে, সে টাকাটা ত ব্যাঙ্ক একেবারে জলে ফেলে দিতে পারে না। টাকাটা শেষ পর্য্যন্ত যাতে আদায় হ'তে পারে, সে বিষয়েও তার কড়া নজর রাখা দরকার। এই নজর রাখতে হ'লেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে এমনি ক্ষমতা ন্যস্ত করতে হবে, যার ফলে এই ব্যাঙ্ক সমস্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। ঠাকুরমহাশয় তার প্রস্তাবিত 'ব্যাঙ্ক-নিয়ামক' সমিতিকে যে সব ক্ষমতা দিতে চেয়েছেন, তা যোগ্যতা অনুসারে একটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তাঁবে রাখাই সমিচীন হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গঠন এবং নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত হবে, তা এই থেকেই অনুমাণ করা যেতে পারে। অংশ মূলধনের ওপর একটা সাধারণ ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের মত করে একে গড়া চলবে না। এ হবে একটা খাঁটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, মূলধন তার ভারত-গভর্ণমেণ্টই যোগাবে। ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ-ভার ন্যস্ত হবে একটা সমিতির ওপর,—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, গভর্ণমেণ্ট সকলের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করবার জন্য বিবিধ সম্প্রদায় থেকে এর মেম্বর নির্ব্বাচিত হ'বে। এর গঠন-রীতি ঠিক কি রকম হওয়া উচিত, তা যথেষ্ট আলোচনা-সাপেক্ষ ব্যাপার; তবে এ থেকেই সে সম্বন্ধে অনেক কিছু অনুমাণ করা যেতে পারে। এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ যে সমিতির ওপর ন্যস্ত হবে, তারই হাতে ব্যাঙ্কের সনদ মঞ্জুর করবার ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল যে, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় যে সব ব্যাঙ্ক-পরীক্ষক বিবিধ

ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করেন, তাঁরা সবাই সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-নিয়ামক কমিটির কর্ত্তৃত্বাধীন। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির কারবারের জন্য দেশের যে স্বার্থ-সংহতি হচ্ছে তা' থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য এবং দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে উন্নতিশীল করে তোলবার পক্ষে এর চেয়ে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রা আর কেউ হ'তে পারে না। কাজেই বিদেশী ব্যাঙ্ককে সনদ দেবার কর্ত্তৃত্ব এই পরিচালক সমিতিরই হাতে থাকা দরকার। ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য অনেক কারণেই একটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য বলে মনে হবে। তবে তা' না হওয়া পর্য্যন্ত ঠাকুরমহাশয়ের প্রস্তাবিত রক্ষা-বন্দোবস্ত ত আছেই।

পরদেশী ব্যাঙ্ক-নিয়ন্ত্রণের বিবিধ প্রস্তাব

এই প্রসঙ্গে ঠাকুরমহাশয়ের আরও কতকগুলি প্রস্তাব বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য বলে মনে হ'বে। সনদ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর মতে আরও কতকগুলি ব্যবস্থা করা দরকার। প্রত্যেক বিদেশী ব্যাঙ্ক যাতে তাদের আদায়ী মূলধনের শতকরা দশ টাকা হিসেবে 'ভারতীয় ব্যাঙ্ক নিয়ামক' সমিতির কাছে গচ্ছিত রাখতে বাধ্য হয়, তিনি তার জন্য একটা পৃথক ব্যবস্থা সমর্থন করেন। উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, গচ্ছিত পরিমাণ টাকা তা হ'লে ভারতীয় আমানতকারীদের একটা ভরসাস্থল হ'তে পারবে। নেহাৎই যদি কোন ব্যাঙ্ক তার ভারতীয় ব্যবসা গুটিয়ে নেয়, তা হ'লে জমা দেওয়া টাকা থেকে আগে স্থানীয় আমানত কারীদের দাবী মিটিয়ে দেওয়া হবে, পরে যদি উদ্বৃত্ত কিছু থাকে তা ব্যাঙ্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ঠাকুরমহাশয়ের এই প্রস্তাব সুযুক্তিপূর্ণ হ'লেও সনদচুক্তির দ্বিতীয় দফা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা কার্য্যকরী হ'লে এ রকম আলাদা রূপে কোন ব্যবস্থা করবার

দরকার হবে না। স্থানীয় আমানতের টাকার অধিকাংশ পরিমাণই যদি এদেশে লগ্নী করা বাধ্যতা-মূলক হয়, আর সে লগ্নী টাকার ওপর যদি তাদের প্রথম দাবী অব্যাহত থাকে, তা হ'লেই ভারতীয় আমানতকারীদের স্বার্থ-রক্ষার যথেষ্ট উপায় র'য়ে গেল, বুঝতে হবে। তার জন্য আবার টাকা জমা দেবার দরকার হবে না। তা ছাড়া ঠাকুরমহাশয়ের প্রস্তাব কার্য্যতঃ প্রয়োগ করাও একটা কারণে জটিল হ'য়ে পড়ে। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির যে মূলধনের শতাংশ হিসেব দেওয়া হয়েছে, সেটা কোন মূলধন বলে বিবেচ্য হবে, ভারতীয় কারবারের, না সমগ্র শাখা সমেত বিদেশী ব্যাঙ্কের? এর যে কোনটা ধরলেই বিপদ। স্থানীয় আমানতের জোরেই যদি এদের কারবারের অধিকাংশ পরিমাণ চালানো সম্ভব হয়, তবে এদের মূলধনের নির্দ্ধারিত শতাংশ হিসেবে যে পরিমাণ টাকা জমা বাবদ আদায় হবে, তার পরিমাণ নিতান্তই সামান্য বলে প্রতিপন্ন হ'তে পারে। আমানত কারীর স্বার্থ রক্ষার মতলব তা হ'লে ব্যর্থ হয়ে যাবে। যদি গোটা বিদেশী ব্যাঙ্কের সমষ্টি মূলধন ধরা যায়, তা হ'লেও একটা গুরুতর আপত্তির কারণ থাকে। ভারতবর্ষে যে সব বিদেশী ব্যাঙ্ক রয়েছে, তাদের সমষ্টি কারবারের অনুপাতে ভারতীয় কারবারের বহর সব ক্ষেত্রেই সমান নয়,—কারো বেশী, কারো কম। এমতাবস্থায় তাদের সকলকেই নিজ নিজ সমষ্টি মূলধনের একটা শতাংশ পরিমাণ টাকা এ দেশে জমা দেওয়াতে বাধ্য করালে, তা নিতান্তই অন্যায় ব্যবস্থা হবে। তার চেয়ে বরং ব্যাঙ্কগুলি যাতে এদেশে গৃহীত আমানতি টাকার একটা শতাংশ পরিমাণ এ দেশেই লগ্নী করতে বাধ্য হয়,—সে রকম একটা ব্যবস্থা করাই সুসঙ্গত হবে। তাতে একটা আপত্তি হ'তে পারে এই যে,

আমানতি টাকার পরিমাণও ত সব সময় এক রকম থাকে না,—তারও ত একটা বাড়তি কমতি আছে; সব সময় ব্যাঙ্ক এই শতাংশ হিসেবটা মেনে চলবে কি করে? এটা বেশ একটু জটিল সমস্যা বটে, কিন্তু তা এড়াতে হ'লে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবেই! দরকার হ'লে ব্যাঙ্কের মাসিক গড়পড়তা আমানত হিসেবের ওপর ভর করে এই শতাংশ হিসেবটা ক'ষে বার করবার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। তাতে হিসেবটা নিখুঁত হবে না নিশ্চয়ই, তবে কি মাসে এই হিসেবটা পরখ করে লগ্নীর পরিমাণ সাব্যস্ত করে দিলে, অন্ততঃ এ কথা ঠিক যে, ব্যাঙ্কের ওপর অযথা খুব অন্যায় করা হবে না। কিন্তু এ যুক্তির মধ্যেও গলদ আছে, এর পর তাই আলোচনা করবার দরকার হবে। আপাততঃ ঠাকুর মহাশয়ের আরও কতকগুলি প্রস্তাবের সারবত্তা বিশ্লেষণ করা যাক। ঠাকুর মহাশয়ের আর একটা প্রস্তাব হ'ল এই যে, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি যে শুধু দেশী-ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আদায়ী 'ইনকম্' প্রভৃতি ট্যাক্স দিতে বাধ্য হবে তাই নয়, তাদের ওপর আলাদা করে আরও কতকগুলি অসাধারণ ট্যাক্স ধার্য্য হবে। তিনি এই অসাধারণ ট্যাক্সগুলির একটা ফর্দ্দ দিয়েছেন। প্রথম এই ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে তাদের আদায়ী-মূলধনের ওপর হাজার পিছু ৪ টাকা ট্যাক্স নেওয়া হবে; এর পর এরা ভারতবর্ষে যে পরিমাণ কর্জ্জ এবং আমানত নিচ্ছে, তার সমষ্টি পরিমাণের ওপর শতকরা ১০৲ টাকা পৃথক ট্যাক্স ধার্য্য হবে। শুধু তাই নয়, ব্যাঙ্কগুলি কেবল মুদ্রা বিনিময়ের জন্যই যে পরিমাণ টাকার কারবার চালাচ্ছে, তার ওপরও হাজারপিছু ২॥৹ টাকা হারে একটা ট্যাক্স আদায় করা হবে। ঠাকুর মহাশয়ের মতে এই রকমারি ট্যাক্স বসাবার উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির ওপর এই

গুরু ভার চাপিয়ে দিলে, তাদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে দেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা অনেক সহজ ব্যাপার হ'য়ে পড়বে। ট্যাক্সগুলি আদায় করতে যে ভয়ানক একটা অন্যায় করা হবে না, তিনি তার জন্যও কিছু কিছু নজীরও দেখিয়েছেন। মূলধনের ওপর ট্যাক্স বসাবার ব্যবস্থা ইতালি এবং স্পেন দু'দেশেই বহাল আছে; আর গৃহীত কর্জ্জ, আমানত এবং বিনিময় কারবারের ওপর যে ট্যাক্স বসানো যেতে পারে, ফরাসী দেশ তার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

অন্য দেশে যাই হোক, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির ওপর এ ধরণের ট্যাক্স বসানো উচিত হবে কিনা, সে বিষয়ে মত-বৈষম্য হ'তে পারে। বিদেশী ব্যাঙ্কের ওপর কতকগুলি অসাধারণ ট্যাক্স বসাবার মতলব যাই হোক না কেন, বা আর যতই নজীর থাকুক, এ কথা ঠিক যে, চোখ কান বুঁজে কতকগুলি প্রতিষেধক আইন করে দিলেই যে সমস্যাটার একটা সমাধান হ'য়ে যাবে, ব্যাপারটা আসলে এত সরল নয়। ট্যাক্সগুলির জের হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে এসেই চাপতে পারে। বিদেশী ব্যাঙ্কের ওপর কতকগুলি নিয়ামক আইন জারী করে দিলেই যে চটপট কতকগুলি দেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক গড়ে উঠবে, এমন কোন সম্ভাবনা নেই। দেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে আরও অনেক আয়োজন করা দরকার হ'য়ে পড়বে। এমনি যখন অবস্থা, তখন যদি কোন কারণে দেশী ব্যাঙ্কগুলি নূতন বিদেশী ব্যাঙ্ক-নিয়ামক আইনের সুবিধা পেয়েও এক্সচেঞ্জ কারবারে হাত দিতে না চায়, তা হ'লে ট্যাক্সের দায় নিঃসন্দেহ ব্যবসায়ীদেরই ঘাড়ে এসে পড়বে। সঙ্ঘ-বদ্ধ বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি সে ক্ষেত্রে বিলের ওপর প্রাপ্য কমিশনের হার চড়িয়েই হো'ক, বা অন্য যে কোন রকমেই হো'ক, ট্যাক্সের পরিমাণ টাকা

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই আদায় করে নেবার চেষ্টা করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। যদি বা কোন দেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তার গোড়া থেকেই এমন ক্ষমতা থাকবার সম্ভাবনা নেই যে, সে বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বিলের ওপর প্রাপ্য হারকে দমিয়ে রাখবে। কমানো সম্ভব হ'লেও সে এত টাকা পাবে কোত্থেকে, যা দিয়ে তার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ বিল কেনা সম্ভব হতে পারে? শেষ পর্যান্ত তাকেও এই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গেই তালে তাল দিয়ে চলতে হবে। নয় ত তারা এই দেশী ব্যাঙ্ককে এমনি কোণঠাসা করবার চেষ্টা করবে যে, ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া তার পক্ষে আর কোন পথই থাকবে না। এই সব কারণে ঠাকুরমহাশয়ের প্রস্তাবের পেছনে যত বড় সদুদ্দেশ্যই থাক না কেন, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির ওপর যা তা কতকগুলি ট্যাক্স বসাতে চাইলেই তা সমর্থন করা চলে না।

তবে কেবল বিনিময় কারবারের জন্যই ঠাকুরমহাশয় যে হাজার পিছু ১৲ টাকা অনুসারে একটা ট্যাক্স আদায় করবার প্রস্তাব করেছেন তার স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হো'ক, ভারতবর্ষে এক্সচেঞ্জ কারবারটা এখন মাত্র কয়েকটা ব্যাঙ্কের একেবারে একচেটিয়া দখলে এসে পড়েছে। কাজেই সাধারণ যৌথ ব্যাঙ্কের মত এদের কাছ থেকে শুধু ইনকম্ ট্যাক্স আদায় করে নিলেই যথেষ্ট হবে না। এর জন্য একটা বিশেষ ট্যাক্স আদায় করা চলতে পারে, তবে দেখতে হবে, যেন তা এমন গুরুতর কিছু না হয়,যাতে ব্যাঙ্কগুলি সে লোকসানের দায় ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করবে। ব্যাঙ্কগুলির লাভের পরিমাণ যদি এমনি ট্যাক্স বসানোর ফলে হঠাৎ খুব কমে যাবার সম্ভাবনা না থাকে, তা হ'লে তারা সে রকম কোন চেষ্টা করবে বলে মনে হয় না।

ট্যাক্সের জুলুম যত কম হবে, তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ততই অক্ষুণ্ণ র'য়ে যাবে। প্রস্তাবিত ট্যাক্স বসালে যে তাদের ওপর খুব জুলুম করা হবে না, নীচের তালিকা থেকে কতকগুলি বিদেশী ব্যাঙ্কের লাভের বহর দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের ওপর লাভের শতকরা হিসাব *

ব্যাঙ্কের নাম	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯
লয়েডস্ ব্যাঙ্ক	১৬৲	১৫·৫৲	১৬৲	...
চার্টার্ড ব্যাঙ্ক	২৬৲	২৪৲	২১৲	...
মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া	২৪৲	২৪·৫৲	২৪৲	...
ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক	১২৲	১২·২৲	১২·৪৲	...
ন্যাসানাল সিটি ব্যাঙ্ক অব্ নিউইয়র্ক	·	২৮৲	১৬৲	২০·৩৲

ওপরের লাভের হিসেবটা করা হ'য়েছে ব্যাঙ্কগুলির সমষ্টি কারবারের ওপর, কেবল ভারতীয় কারবারের ওপর নয়। তা হ'লেও এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এদের ভারতীয় কারবারের ওপর ঠাকুরমহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে শতকরা ১/২ টাকা হিসেবে একটা ট্যাক্স বসালেও যে এদের সমষ্টি লাভের পরিমাণ হঠাৎ খুব কমে যাবে, এমন সম্ভাবনা নেই। হয় ত শতকরা হিসেবে দু'এক টাকা কমে যেতে পারে। কিন্তু তা গিয়েও যা থাকবে, অংশীদারের পক্ষে তা বড় কম নয়। ব্যাঙ্ক-

* ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী তারিখের "ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্স" পত্রিকায় পরিশিষ্টে সম্বলিত কতিপয় বিদেশী ব্যাঙ্কের নিকাশ-পত্র হইতে প্রস্তুত তালিকা।

ব্যবসায়ে শতকরা দশ বার টাকা লাভ হ'লেই তাকে যথেষ্ট বলতে হবে। ব্যাঙ্কগুলি এ পর্য্যন্ত ভারতীয় কারবার থেকে বিস্তর লাভ করে নিয়েছে। এখন কেবল তাদের ভারতীয় কারবারের আয়তন অনুসারেই যদি সামান্য হারে একটা ট্যাক্স বসানো যায়, তা হ'লে আপত্তি উঠবে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে আপত্তিকে উপেক্ষা করা যেতে পারে।

পুরাদস্তুর দেশী একসচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

ভারতে বিদেশী ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ও তার পদ্ধতি সম্বন্ধে তা হ'লে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া গেল। এর জন্যই ব্যাঙ্কগুলিকে সনদ দেবার ব্যবস্থা করবার দরকার হ'য়ে পড়েছে। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই এদের একচেটিয়া কারবারকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে। ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের কাছে মাসিক বা ত্রৈমাসিক বিবরণী পেশ করতে বাধ্য হ'লে এদের কারবারের মধ্যে হেঁয়ালী কিছু আর থাকবে না। তা ছাড়া ব্যাঙ্কগুলির বিনিময়-কারবারের ওপর একটা ট্যাক্স বসালে এদের লাভের অন্ততঃ অংশ পরিমাণও এ দেশে থেকে যাবে, এ কথাও ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল এই যে, তাতে ভারতীয় একস্চেঞ্জ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সহায়তা হবে কি ক'রে? বর্ত্তমানে দেশী ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কেবল 'সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া'ই একস্চেঞ্জ কারবার চালাতে সুরু করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সম্পূর্ণ মূল্যের তুলনায় এই ব্যাঙ্কের একস্চেঞ্জ কারবারের বহর নিতান্তই তুচ্ছ বলে প্রতিপন্ন হবে। বিদেশী ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করলেই ত সমস্যাটার একটা চরম মীমাংসা হ'য়ে যাবে না; সেই সঙ্গে যাতে ক্রমশঃ ভারতীয় ব্যাঙ্কও একস্চেঞ্জ কারবারে ঢু মারতে পারে এও একটা লক্ষ্যের

বিষয় হবে। তা না হ'লে এক্‌সচেঞ্জ কারবারের মোট্টা লাভটা শেষ পর্য্যন্ত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির হাতেই থেকে যাবে।

ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের এক্‌সচেঞ্জ কারবার

এই সমস্যাটা নিয়ে আমাদের দেশে যে নাড়াচাড়া হয় নি, এমন নয়। কেউ কেউ বলেন যে, ভারতবর্ষে একটা খাটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হ'লেই প্রশ্ন উঠবে যে বর্ত্তমান ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে তা হ'লে কি ব্যবস্থা করা হ'বে? ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক এখন একটা নিছক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক না হলেও, কোন কোন বিষয়ে যে একটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই সামিল, এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। গভর্ণমেণ্টের রাজস্বের আদায় প্রায় সবটাই এই ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখা হচ্ছে, তার জন্য এই ব্যাঙ্ককে কোন রকম আমানতি সুদ দিতে হয় না; শুধু এই একটা চুক্তি আছে যে গভর্ণমেণ্টের লেনদেন সব এই ব্যাঙ্কের মারফৎই চলবে, তার জন্যও ব্যাঙ্ক কোন কমিশন আদায় করতে পারবে না। কেবল গভর্ণমেণ্ট যখন বণ্ড বের করে দীর্ঘকালস্থায়ী ঋণের টাকা সংগ্রহ করবে, তাই থেকে ব্যাঙ্ককে শতকরা হিসেবে একটা কমিশন দেওয়া হবে। গোড়ায় আর একটা চুক্তি ছিল এই যে, ব্যাঙ্ক গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে বিনা সুদে আমানত নেবার যে সুবিধা পাবে, তার বিনিময়ে তাকে পাঁচ বছরের ভেতর গোটা ভারতে একশ' শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে; উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে বিস্তৃতভাবে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের সুবিধা করে দেওয়া। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এক আইন পাশ করে বম্বে, মাদ্রাজ ও বাংলা এই তিন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-পোষিত ব্যাঙ্ক সংযুক্ত করে ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। তার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্কের শাখাঅফিসের সমষ্টি সংখ্যা একশ' অতিক্রম করে গিয়েছে। এই

১৯২০ খৃষ্টাব্দের আইনে যে সব ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তার মধ্যে একটাই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সেটা হচ্ছে এই যে, ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ককে প্রথম থেকেই এক্সচেঞ্জ কারবার চালাতে বারণ করা হ'য়েছে। লণ্ডনে এর একটা শাখা অফিস আছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এখানকার হেড্ অফিসের যে এক্সচেঞ্জ কারবার চলে, তা শুধু গভর্ণমেণ্ট বা ব্যাঙ্কের নিজ পুরোণো মক্কেলদের জন্যই চালানো যেতে পারে। এদের কারও বিলেতে টাকা পাঠাবার দরকার হ'লে বা সেখান থেকে টাকা আনাবার দরকার হ'লে এই ব্যাঙ্কই তার সহায়তা করে থাকে। এ রকম কারবারের সমষ্টি মূল্য প্রায় ৫।৬ কোটি টাকার সামিল হবে। সাধারণ ব্যবসায়ী অর্থাৎ আমদানিকার বা রপ্তানিকারের বিল কেনা বেচার সঙ্গে ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের কোন সম্পর্ক নেই। সে সব কারবার এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলিরই একচেটিয়া দখলে র'য়েছে।

কেন এমনি ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল, এর পর সে কথাই মনে হবে। ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের মত একটা বিপুল শক্তি ব্যাঙ্কের পক্ষে এক্সচেঞ্জ কারবার চালানো সম্ভব ছিল না, এ কথা মেনে নেওয়া কঠিন; বিশেষ করে লণ্ডনে যখন এর একটা শাখা অফিস রয়েছে, তখন ত বটেই। তবু তাকে যে কেবল আইনের জোরে এ ব্যবসায়ে হাত দিতে দেওয়া হয় নি, তার কারণ কি হ'তে পারে? একটা যুক্তি হ'তে পারে এই যে, গভর্ণমেণ্টের তহবিল যে ব্যাঙ্কের তাঁবে থাকবে তার পক্ষে এক্সচেঞ্জ কারবারের মত বিপত্তিজনক ব্যবসায়ে হাত না দেওয়াই সঙ্গত। এ ছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, বর্ত্তমান এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি অনেক সময়ই ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখছে,—তা ছাড়া সে ব্যাঙ্ক গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকেও বিস্তর টাকা বিনাসুদে আমানত পাচ্ছে; সুতরাং ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক নিজেই যদি

এক্সচেঞ্জ কারবারে হস্তক্ষেপ করে, তা হ'লে সেটা খুব অন্যায় প্রতিযোগিতা করা হবে না কি? এই যুক্তিগুলির সারবত্তা একেবারে চোখকান বুঁজে মেনে নেবার মত নয়। এক্সচেঞ্জ কারবার ঠিক ফট্‌কা-বাজীর মতই যে একটা বিপত্তিজনক কারবার নয়, তা মানতেই হবে। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির 'ডিভিডেণ্ড'এর তালিকাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর গভর্ণমেণ্টের সহায়তা পাচ্ছে বলেই যে কোন ব্যাঙ্ক বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে না, এটা নিতান্ত ফাঁকা যুক্তি। বর্ত্তমান জগতে প্রায় সব দেশেই কোন না কোন শিল্প বা ব্যবসা গভর্ণমেণ্টের সহায়তা পেয়ে বিদেশী শিল্প বাণিজ্যের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে। ভারতবর্ষের বেলায়ই তাতে আপত্তি উঠবে কেন?

ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ

সে যা হোক, কিন্তু একথাও ত ঠিক যে, ভারতবর্ষে একটা খাঁটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গড়ে উঠলে, ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে যে সুবিধা পাচ্ছে, তার অনেকটাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ন্যস্ত করে দিতে হবে। গভর্ণমেণ্টের সহায়তা পাচ্ছে বলে এখন যে আপত্তি ওঠবার কারণ রয়েছে, এর পর আর তা থাকবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু একটা সমস্যা অমীমাংসিতই রয়ে গেল। ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের এক্সচেঞ্জ কারবার চালানো সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে প্রতিষেধক আইন রয়েছে, গভর্ণমেণ্ট তা রদ করে দিতে পারে বটে, কিন্তু তা হ'লেই যে সে ব্যাঙ্ক এই নূতন কারবার চালাতে সুরু করবে, তার কি ভরসা আছে? বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্ক দেশের মধ্যেই নানা জায়গায় শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করে বিস্তৃতভাবে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়

চালাচ্ছে। প্রতিষেধক আইন তুলে নিলেই যে সে আভ্যন্তরীণ কারবার তুচ্ছ করে এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ে উৎসাহিত হ'য়ে উঠবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আর তা হ'লেই যে ভারতীয় এক্সচেঞ্জ-ব্যাঙ্ক সমস্যার সব চেয়ে ভাল সমাধান হ'য়ে যাবে, এমনও নয়। ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক একটা ভারতীয় ব্যাঙ্ক বটে, কিন্তু এর ওপর ভারতবাসীর খুব প্রতিপত্তি নেই। এর অংশীদারদের মধ্যে অভারতীয়ের সংখ্যা যথেষ্ট রয়েছে, তা ছাড়া এর বড় বড় কর্ম্মচারী অধিকাংশই ইংরেজ। এমনি অবস্থায় এই ব্যাঙ্ক যদি এক্সচেঞ্জ কারবারে যোগ দেয়, তা হ'লে এটাও যে বর্ত্তমান ১৮টা ব্যাঙ্কেরই দলভুক্ত হ'য়ে পড়বে না, এমন কি ভরসা আছে? গভর্ণমেণ্ট যদি তার তহবিলের টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেই রাখতে আরম্ভ করে, তা হ'লে ত ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের ওপর তার কোন জবরদস্তি করা চলবে না! ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক যদি এক্সচেঞ্জ কারবার চালাতে চায়, তাতে অবশ্য আপত্তি করবার কিছু নেই, কিন্তু সমস্যাটার সত্যি করে সমাধান হবে তখনই, যখন এক্সচেঞ্জ কারবারের লাভের অন্ততঃ একটা মোটা ভাগ ভারতবাসীর হাতেই এসে পড়বে।

ভারতে বিল-বাজারের বনিয়াদ

এর জন্যই আরও অভিনব একটা কিছু ব্যবস্থা চাই। এই বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির ভারতবর্ষে আমানত নেওয়া যদি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া যায়, তা হ'লে সমস্যাটার অন্ততঃ পরোক্ষভাবে একটা সমাধানের পথ আবিষ্কৃত হবে। এর আগে কয়েকবার বলা হয়েছে যে, এই ব্যাঙ্কগুলি আমানতি টাকা গ্রহণ করতে থাকলে, তা নিয়ন্ত্রণ করা বেশ একটু ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার হ'য়ে পড়ে। এই ঝঞ্ঝাটের হাত এড়ান চলে, অথচ আমাদের অভীষ্টও সিদ্ধ হয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থার দরকার হ'য়ে

পড়েছে। এর ফলাফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, এবার তাই আলোচনা করা যাক।

বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির আমানত নেওয়া বন্ধ করে দিতে চাইলেই প্রশ্ন উঠবে, "তা হ'লে ব্যাঙ্কগুলি রপ্তানি-বিল কিনবে কি দিয়ে? আর রপ্তানি-বিল কেনবার পথ বন্ধ করে দিলে ব্যবসাই বা চলবে কি করে?" প্রশ্নটা আপাতপক্ষে খুব জটিল মনে হ'লেও এতে বিচলিত হ'বার কোন কারণ নেই। পূর্ব্বে একবার বলা হ'য়েছে যে, ব্যাঙ্কগুলির কাছে যে আমদানি-বিল আসে, তা মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের কাছেই পড়ে থাকে। মেয়াদ ফুরোলে তার টাকা আমদানিকারের কাছ থেকে আদায় করা দস্তুর। সাধারণতঃ এর জন্যই ব্যাঙ্ককে প্রায় তিনমাস অপেক্ষা করে থাকতে হয়। এই সময়টুকুর জন্যই এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির ৭৫ কোটি টাকা দরকার হচ্ছে রপ্তানি-বিল কেনবার জন্য। পুস্তকের সমস্যা-বিভাগে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'য়েছে। সেখানে এ কথাও খতিয়ে দেখানো হ'য়েছে যে, বর্ত্তমানে এই ৭৫ কোটি টাকা ব্যাঙ্কগুলি দেশী আমানত থেকেই সংগ্রহ করে নিচ্ছে। আমানত নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া যে বস্তুতঃ এই ৭৫ কোটি টাকারই সমস্যা, তা বুঝতে মুস্কিল হবে না।

কিন্তু এইখানেই ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা ভাল। ব্যাঙ্কগুলির এই ৭৫ কোটি টাকা দরকার হচ্ছে কেন,—আমদানি-বিলগুলি তিনমাস পর্য্যন্ত ধরে বসে থাকতে হয় বলেই না? যদি এই বিলগুলি ভারতবর্ষে আসা মাত্র এ দেশেই ভাঙ্গাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, তা হ'লে ত এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি এই ৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করবার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। তেমন কিছু ব্যবস্থা হ'লে আমানত নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও ত বিল কেনা-বেচার কাজ পূর্ব্বাপর সমানই

চলতে পারে। ভারতবর্ষের একসচেঞ্জ-ব্যাঙ্কসমস্যা সমাধানের গতিপথ র'য়েছে এইখানেই। এর জন্যই দেশের মধ্যে যাতে আমদানি-বিল বেচবার ব্যবস্থা হ'তে পারে, তার আয়োজন করতে হবে।

এ আয়োজন এখন প্রায় সবগুলি উন্নতিশীল দেশেই বর্ত্তমান র'য়েছে। তার ব্যবস্থা করেছে 'বিল বাজার', ইংরেজিতে যাকে বলে 'বিল মার্কেট' বা 'ডিস্কাউণ্ট মার্কেট'। ভারতবর্ষে যে বিল মার্কেট রয়েছে, তা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নি। এ দেশে কেবল রপ্তানি-বিল কেনবারই একটা ব্যবস্থা রয়েছে এই বিদেশী একসচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির হাতে,—তা সে সোজাসুজি রপ্তানিকারের কাছ থেকেই হো'ক, আর দালাল মারফৎই হো'ক। কিন্তু আমদানি-বিল বেচবার জন্য এখানে কোন ব্যবস্থা নেই। এ দেশের বিল বাজারের কারবার তা হ'লে একমুখীই রয়ে গেছে, বুঝতে হবে। সে জন্যই একসচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয় আমানতের ওপর এত নির্ভরশীল হ'য়ে পড়েছে। আর সে জন্যই হয় ত কেউ কেউ মনে করবে যে, ব্যাঙ্কগুলির আমানত নেওয়া বন্ধ করে দিতে গেলে তাদের ওপর একটা ভয়ানক জুলুম করা হবে।

অন্য পাঁচটা দেশে কিন্তু এটা মোটেই একটা সমস্যার ব্যাপার নয়। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকবে না। সেখানে কোন আমদানি-বিল এলেই ব্যাঙ্ক তা ধরে বসে থাকে না। এমনি কোন বিল এলেই ব্যাঙ্ক তা 'ডিস্কাউণ্ট মার্কেট'এ ভাঙিয়ে নগদ টাকা সংগ্রহ করে নেয়, আর তা দিয়েই রপ্তানি-বিল কেনে। এ রকম বিল কেনে কতকগুলি স্থানীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান,—তাদের পরিচয় হ'ল 'ডিস্কাউণ্ট হাউস'। এরা মেয়াদী আমদানি-বিল কিনে টাকা লগ্নী করতে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে এটা যে মস্ত একটা লাভজনক অথচ নিতান্ত দায়শূন্য

কাজ, তা প্রায় সব দেশের ব্যাঙ্ক মহলেই এখন স্পষ্ট প্রমাণ হ'য়ে গেছে। টাকাটা বেশী দিনের জন্ম পড়ে থাকচে না, অথচ তারই ওপর বাটাস্থদ আদায় করে 'ডিস্কাউণ্ট হাউস' বেশ দু'পয়সা রোজগার করে নিচ্ছে; বিলের ওপর আমদানিকারের দায়-স্বীকার থাকবার জন্ম টাকাটা মারা যাবারও কোন আশঙ্কা নেই। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে এর চেয়ে সোজা কাজ আর কি হতে পারে?

তবু এই সোজা কাজটাই ভারতবর্ষে এতদিনেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। তার জন্ম দায়ী হচ্ছে এই একসচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি নিজেই। তাদের কাছে যে আমদানি-বিল আসে, তা বিক্রী করবার জন্ম তারা মোটেই ব্যস্ততা প্রকাশ করে না। আর করবেই বা কেন? রপ্তানি-বিল কেনবার জন্ম নগদ টাকা চাই, তাই না আমদানি-বিল বিক্রী করবার কথা ওঠে।—তা সে টাকা ত এরা আমানত থেকেই সংগ্রহ করে নিচ্ছে। মেয়াদী বিলের ওপর যে স্থদ আদায় হবে, তাই বা তারা ছাড়তে যাবে কেন?

কিন্তু আমানত নেওয়া বন্ধ করে দিলেই ত তারা আমদানি-বিল বেচতে বাধ্য হবে। না হ'লে রপ্তানি-বিল কেনবার টাকা তারা পাবে কোথায়! বিদেশ থেকে টাকা ধার করে এনে কাজ চালানোর একটা কথা উঠতে পারে বটে, কিন্তু অত টাকা চট্ করে সংগ্রহ করে আনা সহজ হবে না,—তা ছাড়া তাতে হয় ত খরচায়ও পোষাবে না। তার চাইতে এরা বরং দেশের মধ্যেই বিল বেচে ফেলবার ব্যাপারটাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করবে।

এইখানে একটা প্রশ্ন আপনি এসে পড়ে যে, আমদানি-বিলগুলি কিনবে কে? কেন, তার জন্মও ত মুস্কিল হবার কথা নয়। বিদেশী ব্যাঙ্কদের আমানত নেওয়া যদি বন্ধ করেই দেওয়া হয়, তা হ'লে তাদের

আমানতি এই ৭৫ কোটি টাকা যাবে কোথায় ? আমানতকারীরা ত আর তা তুলে নিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখবে না ! তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয় ত টাকাটা কোন দেশী ব্যাঙ্কে জমা করে দেবে, আবার কেউ কেউ, বিশেষ করে যারা মহাজনী কারবার চালাতে অভ্যস্ত,—তারা হয় ত আমানতের টাকা দিয়ে নিজেরাই লগ্নী কারবার চালাতে সুরু করবে। এরাই হবে আমদানি-বিলের ক্রেতা। যে সব দেশী ব্যাঙ্ক নূতন করে কতকগুলি আমানতি টাকা পেয়ে যাবে, তাদেরও টাকাটা খাটাতে হবে ত! মহাজনদেরও উদ্বৃত্ত টাকা লগ্নী করবার সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়াবে। তখন এদের উভয়েরই বাড়তি টাকা লগ্নী করবার প্রশস্ত পথ হবে এই আমদানি-বিল কেনা। এরাই হবে ভারতবর্ষের "ডিস্কাউণ্ট হাউস"। এমনি করে এ দেশেই একটা খাটি "ডিস্কাউণ্ট মার্কেট" প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব হবে না।

এইখানে সমস্যাটার একটা প্যাঁচ আরও একটু খোলাখুলি ভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। ভারতবর্ষে যে সব আমদানি-বিল আসে, সেগুলি লেখা হয় পাউণ্ড শিলিংএর অঙ্কে। কাজেই একটা কথা উঠতে পারে যে, এই বিলগুলি দেশী ব্যাঙ্ক বা মহাজন কিনবে কি করে? বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা র'য়েছে সেটা হচ্ছে এই :—একসচেঞ্জ ব্যাঙ্ক বিলের মেয়াদ ফুরোবার দিন টাকার যে বিনিময়-হার প্রবল থাকে,—সেই অনুসারে আমদানিকারের কাছ থেকে টাকার অঙ্কে বিলের মূল্যটা আদায় করে নেয়। এ কাজটার মধ্যে বিলের ওপর ধার্য্য মেয়াদীসুদ ও টাকার বিনিময়-হার দুইই নিহিত রয়েছে, বুঝতে হবে। একসচেঞ্জ ব্যাঙ্কের পেশাই হ'ল মুদ্রা-বিনিময়ের সহায়তা করে দেওয়া,—কাজেই তার পক্ষে এক সঙ্গেই বিনিময়-হার নির্দ্ধারণ ও মেয়াদী সুদ আদায় দু'টোকে যুক্ত করে কারবার চালানো সম্ভব। কিন্তু সাধারণ 'ডিস্কাউণ্ট হাউসের'

পক্ষে এ রকম সংযুক্ত কারবার চালানো দস্তুর নয়। শুধু মেয়াদী বিলের ওপর সুদ আদায় করাই হবে তার একমাত্র লক্ষ্য ;—তাদের কারবারের তাৎপর্য্য হ'ল টাকা লগ্নী করাই, আর কিছু নয়। কাজেই আমদানি-বিল কেনাটা গোড়ায় যত সহজ ব্যাপার মনে করা গিয়েছিল, ব্যাপারটা অন্ততঃ ভারতবর্ষের পক্ষে তত সরল নয়।

কিন্তু তাতেও বিচলিত হ'বার কোন কারণ নেই। এর জন্যও একটা সহজ ব্যবস্থা হ'তে পারে। এদেশে যে আমদানি-বিলগুলি আসে, তাকে ভিত্তি করেই একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি নূতন করে টাকার অঙ্কে বিল লিখে তা ভাঙ্গিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে পারে। এ রকম এক বিলকে আশ্রয় করে আর একটা বিল লেখা বর্ত্তমান ব্যাঙ্ক-জগতে অভিনব ব্যাপার কিছু নয়। একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি অনায়াসেই এর ব্যবস্থা করতে পারে, আর তা হ'লে আমদানি-বিল বেচবার যে অসুবিধা, তাও থাকে না।

উপসংহার

ভারতীয় একস্‌চেঞ্জ-ব্যাঙ্ক সমস্যার জন্য অনেকে অনেক রকম প্রস্তাব করেছেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই [illegible] মাত্রায় উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছে। জোর জবরদস্তি করে অনেক [illegible] রকম ব্যবস্থা বাতলানো চলতে পারে বটে, কিন্তু কেবল তেমনি ব্যবস্থাই গ্রাহ্য হবে, যা ব্যাঙ্ক মহলে বা ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যে একটা বিপর্য্যয় সৃষ্টি করবে না। কোন ব্যবস্থার কত মূল্য, ব্যবসায়ীদের লাভলোকসানের খতিয়ানই হবে তার কষ্টিপাথর। তাদের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন হ'য়ে কোন ব্যবস্থাই করা সমিচীন হবে না,—তাতে স্বাদেশীকতার যত বড় পরোয়ানাই

থাক না কেন। এমনি করেই হয় ত কেউ কেউ সোজা পথ বাৎলে বলবে, "বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে আইনের প্যাচে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চটপট্ কতকগুলি দেশী ব্যাঙ্ক দাঁড় করিয়ে দেও"। এ রকম ব্যবস্থা ঠিক রোগী মেরে দাওয়াই বাতলানোরই সামিল। দেশী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হবে কি না, সে জন্ত তাদেরই লাভ লোকসানের হিসেব পথ দেখিয়ে দেবে,—তাতে জবরদস্তি কোন ব্যবস্থা চলতে পারে না। এ কথা বেশ সমঝে নেওয়া দরকার যে, আইন শুধু নিয়ন্ত্রিতই করতে পারে,—সে নিয়ন্ত্রণের ফলে অনেক কিছু সুবিধে হওয়াও অসম্ভব নয়,—কিন্তু স্বাধীন মনোবৃত্তির ওপর ভর করে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, তার ওপর আইনের কোন হাত নেই।

সমাপ্ত